সন্তু - কাকাবাবু সিরিজ
কাকাবাবু ও
শিশুচোরের দল
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
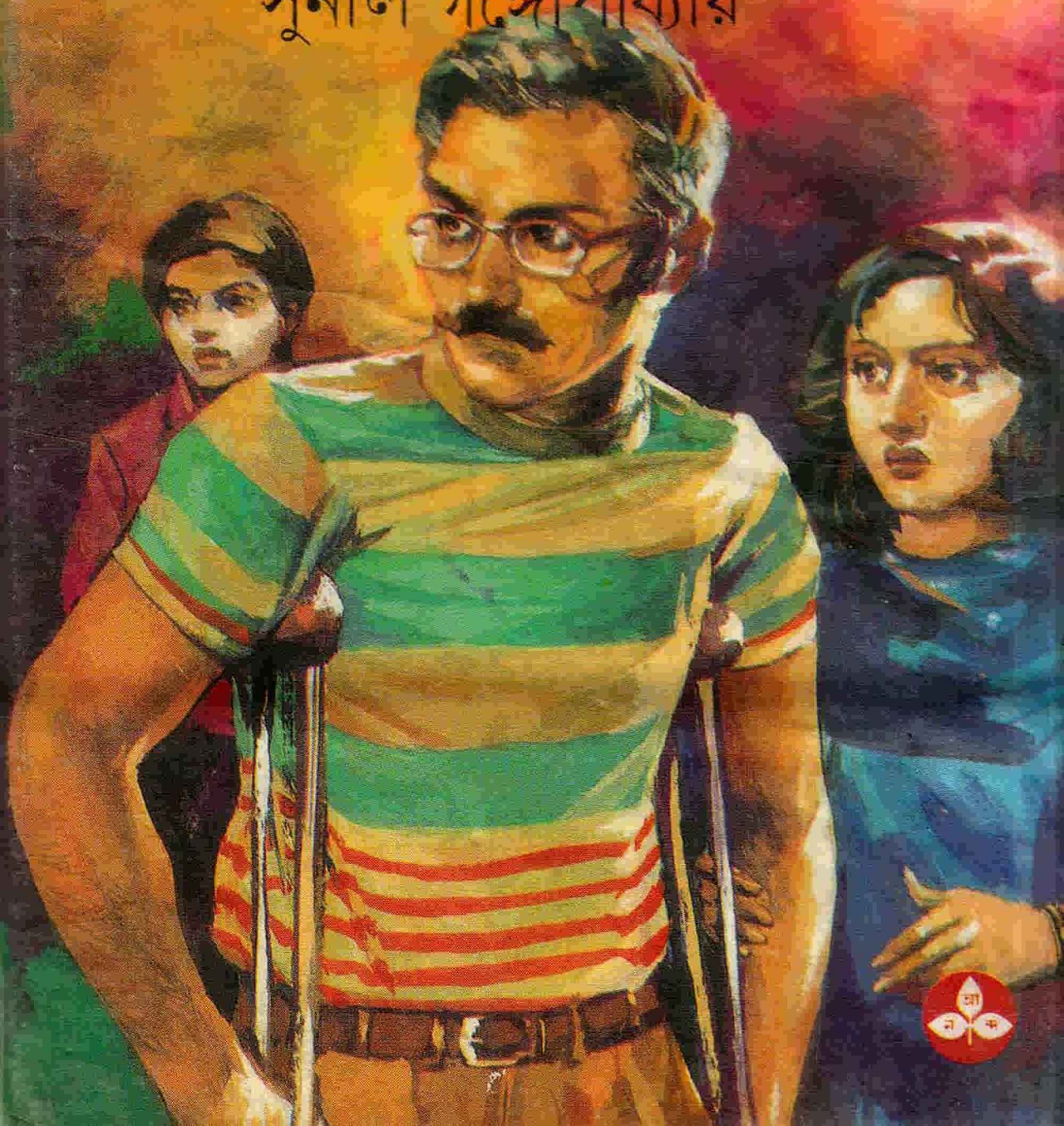
কাকাবাবু ওদের ধরেননি। এরকম ছোটখাটো ঘটনা নিয়ে মাথাও ঘামান না কাকাবাবু। সাধারণ চোর-ডাকাত ধরা তাঁর কাজ নয়।

কাকাবাবু বেশ রেগে আছেন বোঝা যায়। রাগ হলে তিনি তাঁর থুতনিতে চিমটি কাটেন।

আপন মনে আবার বললেন, পুলিশগুলো হয়েছে যত নিষ্কর্মার দল।

মুখ তুলে সন্তুকে বললেন, "দ্যাখ তো রফিকুলকে ফোনে পাওয়া যায় কিনা! এখনও হয়তো বাড়ি থেকে বেরোয়নি!"

রফিকুল আলম সদ্য ডি আই জি হয়েছেন, বড়-বড় অপরাধীদের তাড়া করে বেড়ান। কাকাবাবুর খুব ভক্ত। এ-বাড়িতে প্রায়ই আসেন। মানুষটিকে দেখতে যেমন ভাল, কথাবার্তাও তেমনই ঝকঝকে।

এখন টেলিফোনে কাউকে পাওয়া খুব সহজ। এরকম বড়-বড় অফিসারদের সবার কাছেই মোবাইল ফোন থাকে, বাড়িতে বা অফিসে বা চলন্ত গাড়িতেও কথা বলা যায়। রফিকুল আলমের মোবাইল ফোনের নম্বরে রিং হতেই সন্তু তাদের কর্ডলেস ফোনটা কাকাবাবুর হাতে দিল। সে ধরেই নিল, আলমদা খুব ধমক খাবেন।

কাকাবাবু কিন্তু নরম আর বিনীত গলায় বললেন, "আদাব, রফিকুল আলম সাহেব। আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করলাম। আপনার কি দু' মিনিট কথা বলার সময় হবে?"

রফিকুল বেশ হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, "আপনি কে কথা বলছেন? কাকাবাবু তো?"

কাকাবাবু বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী।"

রফিকুল বললেন, "নমস্কার সার। আপনি হঠাৎ আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছেন কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনারা ব্যস্ত মানুষ, আমি একজন রিটায়ার্ড সাধারণ লোক। তবু দু' মিনিট যদি কথা বলার সুযোগ

দেন!"

রফিকুল বললেন, "কাকাবাবু, আপনি নিশ্চয়ই কোনও কারণে আমার ওপর রেগে গেছেন!"

"না, না, রাগের কী আছে।"

"আমি আসছি আপনার কাছে।"

"না, না, আসতে হবে না, আসতে হবে না। শুধু দুটো কথা জিজ্ঞেস করব।"

"আমি বেশি দূরে নেই। পার্ক স্ট্রিটে। মিনিট দশেকের মধ্যে পৌঁছে যাব।"

"বলছি তো আসতে হবে না। আমার কাছে এসে কেন সময় নষ্ট করবেন?"

"আমি আপনার সময় নষ্ট করতে চাই।"

কাকাবাবু আর কিছু বলার আগেই রফিকুল ফোন বন্ধ করে দিলেন।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, এই ভাংলু আর ছোটগিরি কে?"

কাকাবাবু আবার গলার আওয়াজ বদলে ফেলে রাগের সুরে বললেন, "কে আবার! দুটো মানুষ! কিংবা অমানুষও বলা যেতে পারে।"

সন্তু বুঝে গেল, এখন আর বিশেষ কিছু জানা যাবে না।

সে আবার জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি এখন কফি খাবে?"

কাকাবাবু দেয়ালের ঘড়ির দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "ওই ছোকরা আসুক, মিনিট পনেরো পরে দু' কাপ কফি পাঠিয়ে দিতে বলো!"

সন্তু নীচে নেমে গেল।

ব্যাপারটা সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

তার মনটা কৌতূহলে ছটফট করছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে

কাকাবাবু ইজিপ্টের একটা ম্যাপ নিয়ে খুব মেতে ছিলেন। সেখানে কোনও জায়গায় মাটির তলায় খুব প্রাচীনকালের একটা বিশাল কবরখানা সদ্য আবিষ্কার করা হয়েছে। এমন কয়েকটা মূর্তিও পাওয়া গেছে, যেরকম দেখা যায়নি আগে।

ইজিপ্টের সরকার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কাকাবাবুকে, আর পাঁচদিন পর কাকাবাবুর কায়রো যাওয়ার কথা, সন্তুও সঙ্গে যাবে, সব ঠিকঠাক। এর মধ্যে হঠাৎ ভাংলু আর ছোটগিরি এরকম অদ্ভুত নামের দু'জন কয়েদিকে নিয়ে কাকাবাবু হঠাৎ এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?

ভাংলু আর ছোটগিরি! খবরের কাগজে দেখা যায়, চোর-ডাকাতদের নামই এইরকম হয়, ছেনো, ল্যাংড়া, ছগুলাল, খোঁচন...। ওরা কি ইচ্ছে করে নিজেদের এইসব খারাপ নাম দেয়?

সন্তু বসবার ঘরে এসে দেখল, তার মায়ের সঙ্গে গল্প করছে দেবলীনা।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুই কখন এলি?"

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দেবলীনা বলল, "এই, তুই মুখখানা ওরকম বেগুনভাজার মতন করে আছিস কেন রে?"

সন্তু বলল, "তুই একদিন একটা বেগুনভাজাকে জিজ্ঞেস করিস, তোমার মুখটা চাঁদের মতন নয় কেন?"

মা হাসতে-হাসতে বললেন, "ও মা, সন্তু, তুই মেনে নিলি যে তোর মুখখানা বেগুনভাজার মতন?"

দেবলীনা বলল, "আয়নার সামনে দাঁড়ালে ও নিজেই তো দেখতে পায়।"

মা বললেন, "আমার ছেলের মুখখানা না হয় তোর মতন্ এত সুন্দর নয়, তা বলে তুই ওকে বেগুনভাজা বলে কষ্ট দিবি?"

দেবলীনা বলল, "আমার বাবা শিখিয়েছেন, কানাকে কানা

বলতে নেই, খোঁড়া লোককে খোঁড়া বলতে নেই, কিন্তু বেগুনভাজাকে বেগুনভাজা বলা যাবে না, তা তো জানতাম না!"

সন্তু বলল, "মা, তুমি ওর মুখটা সুন্দর বললে?"

দেবলীনা সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, "খবর্দার, মাসিমা, আমার চাঁদপানা মুখ বলবেন না। শুনলেই বিচ্ছিরি লাগে। আমার মুখখানা কি গোল নাকি?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, গোলই তো! তোর নাম চন্দ্রিমা হলে ভাল মানাত! একমাত্র কান্নার সময় তোর মুখটা লম্বা হয়ে যায়।"

দেবলীনা বলল, "তুই আমাকে কখনও কাঁদতে দেখেছিস?"

মা বললেন, "এই তোরা সকালবেলাতেই ঝগড়া করিস না! লীনা, তুই কী খাবি বল?"

দেবলীনা চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়াল। সে একটা ফিকে নীল রঙের শালোয়ার-কামিজ পরে আছে, এই রংটা তার খুব পছন্দ। সন্তুর চেয়ে দু' বছরের ছোট, কিন্তু লম্বায় প্রায় সন্তুর সমান।

এই জানলা দিয়ে পাশের একটা ছোট পার্ক দেখা যায়।

সেখানে পাড়ার ছেলেদের ক্রিকেট খেলা চলছে। কিছু লোক দেখছেও সেই খেলা।

মা আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কী খাবি বললি না?"

দেবলীনা বলল, "লুচি আর বেগুনভাজা!"

মা সন্তুর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলেন।

মা রান্নাঘরে চলে যাওয়ার পর দেবলীনা আবার চেয়ারে ফিরে এসে বসল, "এই সন্তু, তোরা কবে কায়রো যাচ্ছিস রে?"

সন্তু অবাক হওয়ার ভান করে বলল, "কায়রো যাচ্ছি? কে বলল তোকে?"

"যাচ্ছিস কি না বল!"

"কায়রো কিংবা কামস্কাটকাও যেতে পারি। কিংবা কেনিয়া, কিংবা কেপ অব গুড হোপ। কিংবা কেন্টাকি, কিংবা কালিকট। না, না, কালিকট বাদ, সেখানে আমরা গতবার গিয়েছিলাম, তা হলে কাঁচরাপাড়া কিংবা কেওনঝড়ও হতে পারে। কাকাবাবুর ওপর নির্ভর করছে।"

"কাকাবাবু বুঝি ক-দিয়ে যেসব জায়গার নাম, শুধু সেসব জায়গাতেই যান?"

"এক-একবার এক-একরকম।"

"এবার আমি যাবই যাব!"

"আমার তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু জোজো রাজি হবে না।"

"ওই জোজোটাকেই এবার বাদ দিয়ে দে।"

ঠিক তখনই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জোজো বলে উঠল, "কে আমায় বাদ দিচ্ছে?"

দেবলীনা বলল, "এই রে, অসময়ে যমদূতের আবির্ভাব।"

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, 'যমদূতরা যখনই আসে, তখনই অসময়।"

সন্তু বলল, "জোজো দ্যাখ তো, এই মেয়েটার মুখটা ঠিক চাঁদের মতন সুন্দর নয়?'

বলার সময় সন্তু একটা ভুরু সামান্য কাঁপাল, তাতেই বুঝে নিয়ে জোজো বলল, "হ্যাঁ, অবিকল পূর্ণিমার চাঁদের মতন!"

সন্তু বলল, "আমরা এখন থেকে দেবলীনাকে চন্দ্রিমা বলে ডাকব!"

দেবলীনা বলল, "অ্যাই ভাল হবে না বলছি। আমিও তা হলে তোদের এমন খারাপ নাম দেব—"

সন্তু বলল, "তুই আমাকে বললি বেগুনভাজা, আর জোজোকে বললি যমদূত। এর চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে? আমরা কিন্তু
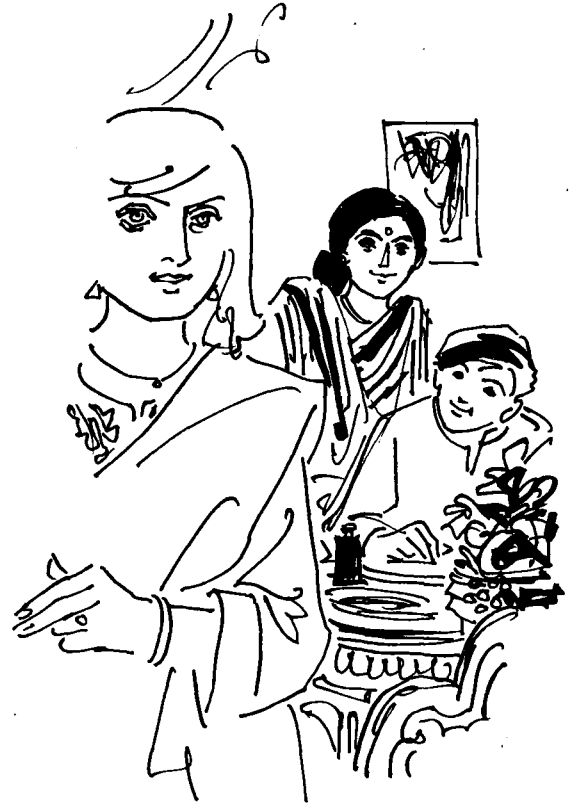
তোর ভাল নাম দিয়েছি।"

জোজো বলল, "তোকে নিয়ে কবিতা লিখলে ভাল মিলও দেওয়া যাবে। তন্দিমা! ভঙ্গিমা! কাঁদিসনি মা!"

দেবলীনা চটি পরে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে যেতে গেল।

সন্তু বলল, "ধর, ধর, জোজো।"

সদর দরজায় পৌঁছবার আগেই দেবলীনাকে ধরে ফেলল জোজো।

এই সময় সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন কাকাবাবু। শার্ট-প্যান্ট-জুতো পরা, বাইরে বেরোচ্ছেন বোঝা গেল। মুখখানা গম্ভীর।

সন্তু ঘড়ির দিকে তাকাল।

রফিকুল আলম দশ মিনিটের মধ্যে এসে যাবেন বলেছিলেন, এর মধ্যে পনেরো মিনিট কেটে গেছে।

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি ন্যাশনাল লাইব্রেরি যাচ্ছি। বউদিকে বলিস, একটু দেরি করে ফিরব, সবাই যেন খেয়েটেয়ে নেয়।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুমি কফি খাবে না?"

কাকাবাবুর বললেন, "নাঃ, দরকার নেই।"

রান্নাঘর থেকে এসে মা বললেন, "রাজা, তুমি বেরোচ্ছ? একটু বসে যাও। গরম-গরম লুচি ভাজছি, খেয়ে যাও দু'খানা।"

কাকাবাবু বললেন, "লুচি? না, এখন লুচিটুচি খাব না।"

দেবলীনা জোজোর কাছ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "কাকাবাবু, তুমি আমাকে হাজরার মোড়ে বাসে তুলে দেবে?"

মা অবাক হয়ে বললেন, "লীনা, তুই চলে যাবি মানে? তুই-ই তো লুচি খাবি বললি!"

জোজো বলল, "এ মেয়ের রাগ হয়েছে। দু'খানা বেশি খাবে।"

কাকাবাবু ক্রাচ দুটো বগলে লাগিয়ে নিলেন।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আলমদা এলে কিছু বলতে হবে?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তো তাকে আসতে বলিনি। যদি তার নিজের কিছু বলার থাকে তো শুনে নিস।"

কাকাবাবু বেরিয়ে যাওয়ার পর জোজো বলল, " কী ব্যাপার রে সন্তু, কাকাবাবুর খুব মেজাজ খারাপ মনে হল। আমার দিকে একবার তাকালেনও না!"

দেবলীনা বলল, "তুমি কী এমন ইম্পর্ট্যান্ট লোক যে তোমার দিকে তাকাতেই হবে!"

জোজো বলল, "তুই তো খুব ইম্পর্ট্যান্ট, তোর সঙ্গেও তো কথা বললেন না।"

সন্তু বলল, "সকাল থেকেই কাকাবাবুর মেজাজটা খাট্টা হয়ে আছে। খুব রেগে আছেন পুলিশদের ওপর।"

"কেন?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না। কাগজের একটা খবর পড়ে... খুবই ছোটখাটো ব্যাপার, হাসপাতাল থেকে দু'জন কয়েদি পালিয়ে গেছে।"

"সে খবরটা তো আমিও পড়েছি। অদ্ভুত নাম, ভোগলু আর খণ্ডগিরি।"

"ভোগলু না, ভাংলু, খণ্ডগিরি না, ছোটগিরি।"

"সে যাই-ই হোক। লোক দুটো পালিয়েছে তো তাতে কাকাবাবু রেগে যাবেন কেন? কাকাবাবুই কি ওদের ধরিয়ে দিয়েছিলেন?"

"নাঃ! তা হলে তো আমি জানতাম।"

মা দুটো বড় প্লেট ভর্তি লুচি আর বেগুনভাজা এনে রাখলেন টেবিলের ওপর। বললেন, "গরম গরম খেয়ে নাও!"

জোজো বলল, "মাত্র এই ক'খানা? মাসিমা, আরও ভাজুন।"

মা বললেন, "খেতে শুরু করো তো!"

দেবলীনা জোজোকে বলল, "এই তুই হাত না ধুয়েই খেতে শুরু করলি যে?"

জোজো বলল, "লেডি চন্দ্রিমা, তুমি আমার হয়ে তোমার দুটো হাতই ভাল করে ধুয়ে এসো। তাতেই হবে। সামনে গরম লুচি দেখলে আমার এক সেকেন্ডও দেরি সহ্য হয় না।"

ঠিক পাঁচ মিনিট পরেই এসে উপস্থিত হলেন রফিকুল আলম।

তিনি সন্তুদের দিকে তাকিয়ে হেসে হাত তুলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছিলেন, সন্তু ডেকে বলল, "আলমদা, এখানে এসে বসুন। লুচি খাবেন?"

রফিকুল বললেন, "দাঁড়াও, আগে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু তো বেরিয়ে গেলেন একটু আগে।"

রফিকুল থমকে গিয়ে বললেন, "আমার দেরি হয়ে গেল, পার্ক স্ট্রিটে এমন জ্যাম ছিল... কাকাবাবু এর মধ্যেই বেরিয়ে গেলেন? নিশ্চয়ই খুব রেগে গেছেন আমার ওপর!"

সন্তু বলল, "তা একটু রেগে আছেন ঠিকই।"

রফিকুল বললেন, "সন্ধেবেলা এসে ক্ষমা চেয়ে নেব।"

খাবার টেবিলের কাছে এসে বললেন, "ব্রেকফাস্ট করে এসেছি, তবু লুচি দেখে লোভ হচ্ছে। একখানা খেয়েই দৌড়তে হবে। অনেক কাজ।"

জোজো বলল, "এমন চমৎকার বেগুনভাজা দেখেও যদি অবহেলা করেন, তা হলে স্বর্গে গিয়ে কৈফিয়ত দিতে হবে।"

রফিকুল বললেন, "পুলিশরা কি আর স্বর্গে যায়? তাদের জন্য দোজখে, মানে নরকে আলাদা জায়গা করা আছে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আলমদা, ভাংলু আর ছোটগিরি, এই দু'জন কিসের জন্য ধরা পড়েছিল?

রফিকুল বললেন, "সন্তু, সকালবেলাতেই ওরকম বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি নাম উচ্চারণ কোরো না। ভাল কিছু বলো, ওরা কারা?"

"ওই যে দু'জন হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে?"

"ও হ্যাঁ, কাগজে পড়েছি বটে। ওদের নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?"

"আমার নয়, কাকাবাবুর। ওই খবরটা পড়েই তো তিনি পুলিশের ওপর রেগে গেলেন।"

"তাই নাকি? এই রে, আমি তো ওদের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি না।"

"সে কী, আপনি এতবড় অফিসার, আপনি সব খোঁজ রাখেন না?"

"সব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে তো মাথা ঘামাতে পারি না। অন্য অফিসাররা দেখেন। পরশু একটা বিরাট ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়েছে জানো তো—"

"হ্যাঁ জানি, পার্ক সার্কাসে, কুড়ি-বাইশ লাখ টাকা।"

"তাই নিয়ে খুব ব্যস্ত আছি, একজন ডাকাত ধরাও পড়েছে। তাকে কাল জেরা করেছি প্রায় সারারাত ধরে—"

দেবলীনা বলল, "একটা ডাকাত ধরা পড়েছে? তাকে কীরকম দেখতে?"

এর মধ্যে দুটো লুচি খেয়ে ফেলেছেন রফিকুল। মা আরও লুচি এনে দিলেন।

রফিকুল বললেন, "কীরকম দেখতে? ভালই চেহারা, চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়েস, প্যান্ট-শার্ট পরা, খানিকটা লেখাপড়াও জানে। ওর ডাকনাম কচি। ভাল নাম গোপাল।"

দেবলীনা আবার জিজ্ঞেস করল, "সারারাত ধরে কী জেরা করলেন?"

রফিকুল বললেন, "এই, টাকাগুলো কোথায় লুকিয়েছে, তার সঙ্গী-সাথীরা কোথায়, এইসব।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "খুব মারলেন তাকে?"

রফিকুল বললেন, খুব না, একটুআধটু তো মারতেই হয়। ভয় দেখাতে হয়।"

"কিছু স্বীকার করল?"

"ঝুড়ি-ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে। ওদের মার খাওয়া অভ্যেস আছে। মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ভান করে।"

"ভান করে? সত্যি-সত্যি অজ্ঞান হয় না?"

"দু'বার ভান করার পর আমাদের এত রাগ হয়ে যায় যে, সত্যি-সত্যি মেরে অজ্ঞান করে দিতে হয়। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, 'দ্যাখ কচি, তুই যেমন ধরা পড়েছিস, তেমনই তোর সঙ্গী-সাথীরাও ঠিকই ধরা পড়বে শেষ পর্যন্ত। টাকাগুলো ভোগ করতে পারবি না। তবু তোরা বোকার মতন কেন এরকম কাজ করতে যাস?"

"সব ডাকাত ধরা পড়ে?"

"বেশিরভাগই। নাইনটি নাইন পারসেন্ট। অথবা ওরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরে।"

"সব ডাকাত যে ধরা পড়ে, তা তো জানতাম না।"

"ডাকাতির খবর যেমন ফলাও করে কাগজে বেরোয়, ধরা পড়ার খবরগুলো তেমনভাবে বেরোয় না। জোজোবাবু, তোমার যদি ভবিষ্যতে ডাকাতি করার প্ল্যান থাকে, তা হলে জেনে রেখো, বাকি জীবনটা তোমায় নির্ঘাত জেলে কাটাতে হবে।"

"ডাকাতিফাকাতি আমার ধাতে পোষাবে না। আমি একটা হিরের খনি আবিষ্কার করব। সে খনিটা কোথায় আছে, তাও মোটামুটি জেনে গেছি।"

"চমৎকার। তখন আমাকে সঙ্গে নিও।"

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে রফিকুল সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "কাকাবাবু কেন ওই হাসপাতাল থেকে পালানো কয়েদি দুটো সম্পর্কে জানতে চাইছেন, তা তুমি বলতে পারো?'

সন্তু মাথা নেড়ে বলল, "না। আমারও অদ্ভুত লাগছে।"

রফিকুল বললেন, "ওই ছিঁচকে চোর দুটোর কী সৌভাগ্য, কাকাবাবুর মতন মানুষ ওদের সম্পর্কে কৌতূহলী হয়েছেন। ঠিক আছে, আমি সন্ধের মধ্যে সব খবর নিয়ে আসছি কাকাবাবুর কাছে। দেরি করে আসার জন্য তুমি আমার হয়ে মাফ চেয়ে নিও।"

সেই যে সকালবেলা এসেছে দেবলীনা, সারাদিন তার বাড়ি ফেরার নাম নেই। তার বাবা টেলিফোন করেছেন দু'বার, সে বলে দিয়েছে, কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা না করে যাবে না।

কাকাবাবু দুপুরে ফেরেননি।

এরকম হয় মাঝে-মাঝে। একবার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়াশোনা শুরু করলে ফেরার কথা আর মনে থাকে না তাঁর। দুপুরে কিছু খেতেও ভুলে যান।

অবশ্য এমনিতেই তাঁর খাওয়া খুব কম। বাড়িতে থাকলেও দুপুরবেলা খান শুধু একটা স্যাণ্ডউইচ। আর কফি।

ছুটির দিনে জোজো সারাদিন সন্তুর সঙ্গেই কাটায়। ওরা একসঙ্গে বই পড়ে, কবিতা মুখস্থ করে, নানারকম খেলাও খেলে। দেবলীনা থাকলেই ঝগড়া হয় অনবরত।

সন্তু আর জোজো ইচ্ছে করে মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে দেবলীনাকে রাগায়। তবে, বেশি রাগালেই মুশকিল। তখন দেবলীনা দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, রাস্তা দিয়েও দৌড়য়। তখন সন্তু আর জোজোকেই ছুটে গিয়ে ধরে আনতে হয়।

দেবলীনার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার স্বভাব আছে। এর মধ্যে অন্তত পাঁচবার সে বাড়ি থেকে পালিয়েছে, পুলিশের সাহায্য নিয়ে খুঁজে বার করতে হয়েছে তাকে। একবার সে একা-একা ট্রেনে চেপে দুর্গাপুর চলে গিয়েছিল।

দেবলীনার একটা মুশকিল, সে বাংলা বই তেমন পড়েইনি। সন্তু আর জোজো যখন কোনও বাংলা গল্প কিংবা কবিতা নিয়ে কথা বলে, তখন দেবলীনা অনেক কিছুই বুঝতে পারে না, রেগে গিয়ে ওদের থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। দেবলীনার অবশ্য একটা গুণ আছে, যা সন্তু কিংবা জোজোর নেই, সে চমৎকার ছবি আঁকে। কিন্তু সেটা তার মুডের ব্যাপার, যখন তখন কেউ বললেও আঁকবে না।

তিনতলায় সন্তুর ঘরের একটা দেয়াল জুড়ে একটা বোর্ড আছে। তাতে নানারকম ছবি ও লেখা সাঁটা থাকে, সেগুলো বদলেও যায় মাঝে-মাঝে। অনেক সময় প্রশ্নও থাকে।

যেমন, সন্তু একটা কাগজে বড় বড় করে লিখল, 'ঘ্যাঁঘো ভূত'!

তারপর দু'জনকে জিজ্ঞেস করল, "একে তোরা কেউ চিনিস?"

জোজো ঠোঁট উলটে জিজ্ঞেস করল, আমি তো চিনিই। এই মেয়েটাকে জিজ্ঞেস কর।"

দেবলীনা বলল, "কী বিচ্ছিরি নাম!"

সন্তু বলল, "ভূতের নাম সুচ্ছিরি হয় নাকি? ওরা এরকম নামই পছন্দ করে।"

দেবলীনা বলল, "ভূতকে আমি চিনতে যাব কেন? ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি?"

সন্তু বলল, "এটা গল্পের বইয়ের ভূত। ঘ্যাঁঘো ভূত খুব বিখ্যাত।"

দেবলীনা বলল, "কী গল্পটা শুনি?"

সন্তু বলল, "ওসব চলবে না। গল্প তো শোনে বাচ্চারা। কিংবা যারা লেখাপড়া শেখে না। নিজে পড়ে নে, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা চমৎকার সব ভূতের গল্প আছে।"

দেবলীনা বলল, "লেখকের নামটাও এমন বাজে...ওসব আমি পড়তে পারব না!"

জোজো বলল, "ভূত বলে কিছু নেই? আমিও আগে বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু একবার শ্রীলঙ্কায় গিয়ে কী দেখেছি জানিস? নিজের চোখে, স্বচক্ষে যাকে বলে—"

দেবলীনা বলল, "তুই ভূত দেখেছিস? কীরকম, শুনি?"

সন্তু বলল, "এই, রাত্তির না হলে ভূতের গল্প জমে না। এখন তো সবে সন্ধে।"

দেবলীনা বলল, "তা হোক। এখনই বল।"

জোজো চোখ নাচিয়ে বলল, "যারা বলে ভূতে বিশ্বাস করি না, তারাই বেশি-বেশি ভূতের গল্প শুনতে চায়। যাই হোক, সংক্ষেপে বলছি—"

দেবলীনা বলল, "নো, নট সংক্ষেপে। পুরোটা।"

জোজো বলল, "ঠিক দু' বছর আগে, সেপ্টেম্বর মাসে বাবার সঙ্গে কলম্বোয় গিয়েছিলাম। ক্রিকেট খেলোয়াড় রণতুঙ্গার বউয়ের খুব পেটে ব্যথা, কোনও ডাক্তার কিছুই ধরতে পারছে না, অস্ট্রেলিয়ায় গিয়েও..."

গল্পে বাধা পড়ল। রঘু একটা কর্ডলেস ফোন এনে বলল, "লীনা দিদিমণিকে ওনার বাবা ডাকছেন।"

দেবলীনা ফোনটা নিয়ে বলল, "কী বাপি, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? কাকাবাবুর সঙ্গে আমার জরুরি দরকার আছে। দেখা না করে যেতে

পারছি না। আমি ঠিক ফিরে যাব।”

ওর বাবা বললেন, “রাত হয়ে গেলে তুই একা ফিরবি কী করে? আমি গিয়ে নিয়ে আসব?”

দেবলীনা বলল, “তোমায় আসতে হবে না। আমায় জোজো পৌঁছে দেবে।”

ওরা বাবা বললেন, “আমি এখন গিয়ে নিয়ে আসতে পারতাম।”

দেবলীনা বলল, “বাপি, তোমার কি একলা লাগছে? টিভি দ্যাখো না!”

বাবা বললেন, “কাকাবাবুর সঙ্গে তোর আজকেই এত জরুরি দরকারটা কিসের রে?”

দেবলীনা বলল, “বাঃ, মংলু আর ছোটলাটের কথা জিজ্ঞেস না করে যাব কী করে? রাত্তিরে ঘুম হবে না।”

বাবা বললেন, “মংলু আর ছোটলাট? তারা কারা?”

দেবলীনা বলল, “ওরা খুব ফেমাস চোর।”

ওর বাবা দারুণ অবাক হয়ে বললেন, “ফেমাস চোর?”

সন্তু হো-হো করে হেসে উঠল।

আর দু-একটা কথা বলে ফোন ছেড়ে দিয়ে দেবলীনা সন্তুর দিকে চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “হাসলি কেন?”

সন্তু বলল, “একে তো চোর দুটোর নাম মংলু আর ছোটলাট নয়। তারা এর মধ্যে ফেমাস হয়ে গেল? ফেমাস কাদের বলে জানিস? যাদের নাম সবাই মনে রাখে।”

দেবলীনা বলল, “তা হলে ওদের নাম কী?”

সিঁড়িতে ক্রাচের ঠকঠক শব্দ শুনে বোঝা গেল, কাকাবাবু ফিরেছেন।

জোজো উঁকি মেরে দেখে বলল, “আলমদাও একসঙ্গেই এসেছেন। চল, আলমদার বকুনি খাওয়াটা দেখি।”

ওরা হুড়মুড়িয়ে নেমে এল দোতলায়।

কাকাবাবু কিন্তু শান্তভাবেই বললেন, “বোসো রফিকুল। আমি জামা-প্যান্ট ছেড়ে নিই। সন্তু, কফি দিতে বল।”

কাকাবাবু বাথরুমে ঢুকে গেলেন।

প্রথম কয়েক মিনিট ওরা সবাই চুপচাপ।

তারপর দেবলীনা ফস করে রফিকুলকে জিজ্ঞেস করল, “তুমি গগাঁ ভূতকে চেনো?”

রফিকুল ভুরু কুঁচকে বললেন, “গগাঁ ভূত! গগ্যাঁ নামে একজন শিল্পীর কথা জানি।”

সন্তু বলল, “গগাঁ নয়, ঘ্যাঁঘো ভূত।”

রফিকুল বললেন, “ও, ত্রৈলোক্যনাথের গল্প? হ্যাঁ, পড়েছি! দারুণ মজার।”

সন্তু বলল, “তুই ছাড়া সবাই পড়েছে।”

দেবলীনা জোজোকে বলল, “তোর গল্পটা থেমে গেল...এখন বল!”

জোজো বলল, “যাঃ! অনেক সময় লাগবে, এখন বলা যাবে না।”

কাকাবাবু সাদা পাঞ্জাবি আর পাজামা পরে এসে বসলেন নিজের চেয়ারে। সকালবেলার মতন মুখে বিরক্ত ভাবটা নেই, বরং দেবলীনা আর জোজোর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, “সকালবেলাতেও তোমাদের দেখে গেলাম, সারাদিন খুব গল্প হচ্ছে বুঝি?”

দেবলীনা বলল, “তুমি এত দেরি করে ফিরলে কেন? আমি তো তোমার সঙ্গে গল্প করতেই এসেছি।”

কাকাবাবু বললেন, “তা হলে তো খুব অন্যায় হয়ে গেছে। আগে ফেরাই উচিত ছিল।”

রফিকুল বললেন, “কাকাবাবু, আমাকে মাফ করবেন।

সকালবেলা পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল...”

কাকাবাবু ওঁর মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন।

তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, “তোমার মাফ চাইবার কিছু নেই। কলকাতার রাস্তায় দেরি তো হতেই পারে। সকালবেলা একটা খবর পড়ে আমার মেজাজটা হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। জানি, এতে তোমার কোনও দায়িত্ব নেই। ওই লোক দুটোর সঙ্গে আমার কথা বলার খুব ইচ্ছে ছিল। তার আগেই তারা পালিয়ে গেল।”

রফিকুল বললেন, “যে কনস্টেবলটি হাসপাতালে রাত্তিরে পাহারায় ছিল, সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সেই সুযোগে ওরা পালায়। কনস্টেবলটিকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “তার নাম কী?”

“বিমল দুবে। আর যে-আসামি দু'জন পালিয়েছে, তাদের আসল নাম শেখ গোলাম নবি আর গিরিনাথ দাস। ধরা পড়েছে টালিগঞ্জের এক বস্তিতে।”

“ওরা নিজেদের মধ্যে যেসব ডাকনাম চালু করে, তার বিশেষ মানে থাকে। যার নাম ভাংলু, সে নিশ্চয়ই ভাঙচুর করায় এক্সপার্ট। তালা ভাঙতে পারে, মানুষের মাথাও ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে। আর, ওদের কারও নাম ছোটগিরি হলে বুঝতে হবে, গিরি নামে নিশ্চয়ই দলে আর একজন আছে। সে বড়গিরি।”

“ওরা অবশ্য ছোটখাটো ক্রাইমই করে। বাংলাদেশ বর্ডারে চোরাচালান, মানুষ পারাপার, চোরাই জিনিস বিক্রি, এইসব। খুন কিংবা ডাকাতির অভিযোগ নেই ওদের নামে।”

কাকাবাবু হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠে বললেন, “তুমি মোটেই সব খবর জানো না। ভয়ঙ্কর কোনও খুনি কিংবা ডাকাতের চেয়েও ওরা বড় অপরাধী।”

তারপর সন্তুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যারা ছোট-ছোট শিশুদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, তারা সমাজের সবচেয়ে বড় শত্রু! তাদের অতি কঠিন শাস্তি দেওয়া উচিত। জিনিসপত্র চোরাচালানের চেয়েও ওদের আসল কাজ ছোট ছেলেমেয়েদের বিক্রি করা। এবারে ওরা বাংলাদেশ থেকে চুরি করে এনে একডজন বাচ্চাকে বিক্রি করে দিয়েছে। সেই বাচ্চাদের বয়েস মাত্র ছ'-সাত বছর!"

দেবলীনা জিজ্ঞেস করল, "অত বাচ্চাদের এখানে কে কেনে?"

জোজো বলল, "ওদের চোখ কানা করে কিংবা হাত-পা কেটে রাস্তার ভিখিরি বানায়, তাই না?"

কাকাবাবু বললেন, "না। ওসব আগে হত, এখন হয় না। আরব দেশের লোকদের কাছে এই বাচ্চাদের বিক্রি করে দিলে অনেক বেশি লাভ হয়।"

দেবলীনা জিজ্ঞেস করল, "আরব দেশের লোকেরা ওদের নিয়ে কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "শুনলে তুমি ভয় পাবে না তো? ওখানে উটের দৌড় প্রতিযোগিতা হয়। ঘোড়দৌড়ের মতন। ঘোড়দৌড়ে জকিরা ঘোড়া চালায়। উটের দৌড় কিন্তু সেরকম নয়। প্রত্যেকটা উটের পিঠে একটা করে বাচ্চা ছেলেকে বসিয়ে দেওয়া হয়, তারপর চাবুক মারলেই উটগুলো দৌড়তে শুরু করে। বাচ্চাগুলো ভয়ে চিৎকার করে, কাঁদে । তাই দেখে লোকেরা আনন্দ পায়। অনেক বাচ্চা উটের পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে গিয়ে মরেও যায়।"

দেবলীনা দু' হাতে মুখ ঢেকে বলে উঠল, "আর শুনতে চাই না। আর শুনতে চাই না!"

কাকাবাবু বললেন, "ওর সামনে বলাটা ঠিক হয়নি।"

রফিকুল বললেন, "আমি একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতির কেস নিয়ে খুব

ব্যস্ত ছিলাম, তাই এই ব্যাপারটা ঠিক জানতাম না।"

কাকাবাবু বললেন, "ব্যাঙ্ক ডাকাতির চেয়েও এটা আরও বড় অপরাধ নয়?"

দেবলীনা মুখ থেকে হাত সরাল। তার গাল বেয়ে কান্না গড়াচ্ছে। সে ধরা গলায় বলল, "কাকাবাবু, মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "সত্যি, কিছু-কিছু মানুষ বড় নিষ্ঠুর হয়। রোমান আমলে স্টেডিয়ামের মধ্যে ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে ক্রীতদাসদের ছেড়ে দেওয়া হত, হাতে একটা অস্ত্র দিয়ে। সিংহের সঙ্গে কোনও মানুষ পারে? সিংহ সেই লোকটাকে মেরে কামড়ে-কামড়ে খেত আর হাজার হাজার মানুষ তাই দেখে আনন্দ পেত। তারপর কত বছর কেটে গেছে, মানুষ অনেক সভ্য হয়েছে, তবু অনেক মানুষের মধ্যে সেরকম নিষ্ঠুরতা রয়ে গেছে।"

সন্তু বলল, "আরব দেশের যারা এই বাচ্চাদের নিয়ে উটের দৌড় করায় তাদের অপরাধ তো আরও বেশি। তাদেরই শাস্তি দেওয়া উচিত।"

কাকাবাবু বললেন, "তা ঠিক। কিন্তু অন্য দেশের লোকদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা তো আমাদের নেই। আমাদের দেশ থেকে যাতে শিশু বিক্রি বন্ধ হয়, আমরা সে চেষ্টা করতে পারি। এর একটা বিরাট চক্র আছে। এই ভাংলু আর ছোটগিরি সামান্য চুনোপুঁটি হতে পারে, কিন্তু ওরা সেই চক্রের অঙ্গ। ওদের জেরা করে সেই চক্রটা ভেঙে দেব ভেবেছিলাম।"

রফিকুল বললেন, "ওদের দু'জনকে আবার ঠিক ধরে ফেলব।"

কাকাবাবু বললেন, "আজকের কাগজে খবর বেরিয়েছে, তার মানে ওরা পালিয়েছে গত পরশু রাতে। মাঝখানে প্রায় দু'দিন কেটে গেছে। এখন ওরা এমন জায়গায় ঘাপটি মেরে থাকবে যে, পুলিশ কিছুতেই সন্ধান পাবে না।"

রফিকুল বললেন, "তবু আমি কথা দিচ্ছি, যথাসাধ্য চেষ্টা করে—"

কাকাবাবু বললেন, "দেরি হয়ে যাবে। আচ্ছা, যে পুলিশটাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, তার কী যেন নাম বললে? বিমল দুবে, সে কোথায় থাকে?"

রফিকুল বললেন, "আলিপুর পুলিশ লাইনের ব্যারাকে।"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে কিছু চিন্তা করে কাকাবাবু বললেন, "সাসপেন্ড হওয়া মানে তো কিছুদিন ডিউটিতে না গিয়ে বাড়িতে বসে থাকা। সেখানে গিয়ে কোনও লাভ হবে না। কলকাতা শহরে ওই বিমল দুবের কোনও আত্মীয়স্বজন থাকে কিনা খোঁজ নাও তো। খুব সম্ভবত কেউ আছে।"

রফিকুল বললেন, "এক্ষুনি জেনে নিচ্ছি।"

পকেট থেকে ফোন বার করে তিনি কার সঙ্গে যেন কথা বলতে লাগলেন।

একটু পরে ফোন বন্ধ করে তিনি কাকাবাবুকে বললেন, "আপনি ঠিক ধরেছেন। ওর ছোট বোনের স্বামী মাখনলাল আছে এখানে, ডালহৌসির একটা অফিসে কেয়ারটেকারের কাজ করে। জি.পি.ও-র খুব কাছে। সেখানেই কোয়ার্টার।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার সঙ্গে তো গাড়ি আছে। চলো, সেখানে একবার ঘুরে আসা যাক।"

দেবলীনা সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, "আমিও যাব।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি কোথায় যাবে? সন্ধে সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। এবার তোমার বাড়ি ফেরা উচিত। তোমার বাবা চিন্তা করবেন।"

দেবলীনা বলল, "আমি যাবই, যাবই, যাবই, যাব!"

কাকাবাবু বললেন, "সেখানে তো তেমন কিছু দেখার থাকবে না।

হয়তো লোকটাকে বাড়িতেই পাওয়া যাবে না।"

দেবলীনা আবার জোর দিয়ে বলল, "আমি যাবই, যাবই, যাবই, যাব!"

কাকাবাবু হেসে উঠে বললেন, "এ এক পাগলি মেয়ে। চলো, তবে সবাই মিলেই যাওয়া যাক। যদি কিছু পাওয়া না যায়, তা হলে গঙ্গার ধারটায় একটু বেড়িয়ে আসা হবে।"

যদিও নতুন নাম হয়েছে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ, সংক্ষেপে বি-বা-দী বাগ, তবু লোকের মুখে-মুখে এখনও ডালহৌসি স্কোয়ার নামটাই চলে। ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে চলে গেছে কত বছর আগে, এখনও রয়ে গেছে তাদের অনেক চিহ্ন।

দিনের বেলায় এই অফিসপাড়ায় কত ব্যস্ততা থাকে, কত মানুষজন, কত গাড়ি, কতরকম আওয়াজ। সন্ধের পর ফাঁকা, একেবারে শুনশান। একটা বেশ মস্তবড় চাঁদ উঠেছে। লালদিঘির জলেও সেই চাঁদটা দুলছে।

অফিসবাড়িটা খুঁজে পেতে দেরি হল না। পুরো বাড়িটা অন্ধকার, শুধু আলো জ্বলছে পেছনের কেয়ারটেকারের ঘরে।

সেখানে দরোয়ানটরোয়ান আরও কয়েকজন থাকে। সামনের ছোট বারান্দায় একটা তোলা উনুনে রুটি সেঁকছে একজন, তার খালি গায়ে মোটা পৈতে।

একসঙ্গে এতজনের একটা দল আসতে দেখে সে লোকটি কৌতূহলী হয়ে চেয়ে রইল।

কাছে এসে কাকাবাবু বললেন, "রুটি সেঁকার গন্ধটা চমৎকার লাগে। তুমিই মাখনলাল নাকি?"

লোকটি নিঃশব্দে দু' দিকে মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "মাখনলাল থাকে তো এখানে? সে কোথায়?"

লোকটি এবারেও মুখে কিছু না বলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বারান্দার কোণের ঘর।

সে ঘরের দরজায় এর মধ্যেই একজন এসে দাঁড়িয়েছে।

এই লোকটিরও খালি গা, বেশ একখানা ভুঁড়ি আছে। মাঝবয়েসি, মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা, তাকিয়ে আছে ভুরু কুঁচকে।

এগিয়ে গিয়ে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমিই মাখনলাল?"

লোকটি বলল, "হ্যাঁ, আপনারা কোথা থেকে আসছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "ভবানীপুর থেকে। কিংবা লালবাজার থেকেও বলতে পারো। বিমল তোমার কে হয়?"

মাখনলাল বলল, "কে বিমল? অনেক বিমল আছে।"

"বিমল দুবে, পুলিশে কাজ করে। তার বোনকে তুমি বিয়ে করোনি?"

"ও সেই বিমল। হঠাৎ তার কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?"

"সে কি মাঝে-মাঝে আসে তোমার এখানে?"

"না তো! তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।"

"কেন, ঝগড়া হয়েছে নাকি?"

"এসব কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন? সে কিছু করেছে? আমি অনেকদিন তার কোনও খোঁজখবর রাখি না।"

"দু-একদিনের মধ্যে সে তোমার কাছে আসেনি?"

"না।"

"তুমি দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছ কেন? আমরা একটু ভেতরে

গিয়ে বসব। জল খাব। তোমার সঙ্গে আরও কথা আছে।"

"আসুন।"

লোকটি সরে দাঁড়াল।

ঘরটা বেশ বড়। একপাশে একটা চৌকি পাতা। শুধু একটা মোড়া ছাড়া আর কোনও বসার জায়গা নেই। ক্যালেন্ডার থেকে কাটা অনেক ঠাকুর-দেবতার ছবি দেয়ালে সাঁটা রয়েছে। থালা-বাসন, হাঁড়িকুড়ি ঘরের এককোণে জড়ো করা। তার পাশে একটা আলনায় ঝুলছে জামাকাপড়।

ঘরের চারদিকে চোখ বুলোতে-বুলোতে কাকাবাবু বললেন, "কই হে, এক গেলাস জল খাওয়াও!"

লোকটি কুঁজো থেকে একটা কাঁসার গেলাসে জল গড়িয়ে এনে দিল।

কাকাবাবু গেলাসটা নেওয়ার সময় লক্ষ করলেন, মাখনলালের হাত একটু-একটু কাঁপছে।

জলে একটিমাত্র চুমুক দিয়ে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বউ থাকে না এখানে?"

মাখনলাল বলল, "থাকে, এখন নেই।"

"কোথায় গেছে? বাপের বাড়ি?"

"না। হাসপাতালে আছে। তার টাইফয়েড হয়েছে।"

"কোন হাসপাতালে? যেখানে বিমল দুবে পাহারায় ছিল?"

"বিমল কোথায় পাহারায় ছিল, তা আমি জানি না।"

"তোমার বউ কোন হাসপাতালে আছে?"

"পি জি।"

কাকাবাবু রফিকুলের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন? তিনি মাথা নাড়লেন দু'বার।

কাকাবাবু সন্তুদের জিজ্ঞেস করলেন, "তোরা কেউ জল খাবি?"

আর কারও তেষ্টা পায়নি।

কাকাবাবু হঠাৎ আলনার পাশের একটা বড় মাটির জালার দিকে ক্রাচটা তুলে বললেন, "এটার মধ্যে কী আছে?"

মাখনলাল বলল, "চাল, শস্তার সময় আমি চাল কিনে রাখি।"

কাকাবাবু সেটার কাছে গিয়ে বললেন, "তুমি বুঝি রুটির চেয়ে ভাত বেশি পছন্দ করো?"

মাখনলাল বলল, "আমি দু'বেলাই ভাত খাই। আমার বউও ভাত ভালবাসে।"

কাকাবাবু বললেন, "বেশ, আমিও ভাত ভালবাসি। সেদ্ধ চাল, না আতপ চাল?"

খানিকটা চাল তিনি তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন। মাখনলালের দিকে তাকিয়ে যেন অকারণেই হাসলেন একটু।

তারপর সন্তুকে বললেন, "এটার মধ্যে হাত ডুবিয়ে দেখ তো, চাল ছাড়া আর কী আছে?"

মাখনলাল সন্তুকে বাধা দিতে আসতেই তিনি ক্রাচটা তুলে তার মুখের সামনে আটকালেন।

সন্তু জালাটার মধ্যে অনেকখানি হাত ঢুকিয়ে একটা কাগজের প্যাকেট বার করে আনল। তার মধ্যে গোছা-গোছা টাকা।

কাকাবাবু হাসিটা চওড়া করে বললেন, "কী করে বুঝলাম বলো তো রফিকুল? মাখনলালের হাত কাঁপছে আর বারবার এই জালাটার দিকে না তাকিয়ে পারছিল না।"

রফিকুল বললেন, "সেটা আমিও লক্ষ করেছি। ওর ভাবভঙ্গি দেখেই বোঝা গিয়েছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "ওহে মাখনলাল, তোমার তো দেখছি অনেক টাকা। ব্যাঙ্কে না রেখে চালের মধ্যে রেখেছ কেন? তাতে কি ভাতের স্বাদ আরও ভাল হয়?"

মাখনলালের মুখখানা শুকিয়ে গেছে। সে কোনও কথা বলতে পারল না।

সবই পাঁচশো টাকার নোট। অন্তত পঁচিশ-তিরিশ হাজার টাকা হবেই।

রফিকুল এগিয়ে এসে মাখনলালের কাঁধে হাত রেখে বন্ধুর মতন জিজ্ঞেস করলেন, "এগুলো তোমার নিজের টাকা, না কেউ রাখতে দিয়েছে?"

মাখনলাল বলল, "আমার নয় ... ও টাকা ... ওখানে কে রেখেছে, আমি জানি না!"

এবারে রফিকুল ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে দারুণ ধমক দিয়ে বললেন, "ফের মিথ্যে কথা বলছিস? ভূতে এসে তোর ঘরে টাকা রেখে গেছে?"

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "তা হলে তো ভালই হল। ও বলছে টাকাটা ওর নয়, কে রেখে গেছে তাও জানে না। তা হলে টাকাগুলো আমরাই নিয়ে যেতে পারি!"

রফিকুল মাখনলালকে বললেন, "বিমল দুবে'র সঙ্গে তোর পি জি হাসপাতালে দেখা হয়নি?"

মাখনলাল বলল, "আমি তার সঙ্গে কথা বলি না।"

"ঝগড়া হয়েছে? তোর বউ কথা বলে?"

"সে বলতে পারে।"

"টাকাটা বিমল তোকে কিংবা তোর বউকে রাখতে দিয়েছে, তাই না? সত্যি করে বল?"

কাকাবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, "দরজার কাছ থেকে কে সরে গেল? ধরো তো লোকটাকে।"

সন্তু আর জোজো ছুটে বেরিয়ে গেল।

সত্যিই একজন লোক দৌড়ে পালাচ্ছে। ওরা দু'জন আরও

জোরে ছুটে জাপটে ধরল লোকটাকে। সে দু'হাতে ঘুসি চালাতে লাগল।

রফিকুলও বেরিয়ে এসেছেন। কড়া গলায় বললেন, "এই, এদিকে আয়। হাত দুটো তুলে রাখ।"

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে সন্তুদের ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল আর পায়ে পা ঠুকে স্যালুট করল রফিকুলকে।

রফিকুল জিজ্ঞেস করলেন, "এই, পালাচ্ছিলে কেন?"

লোকটি বলল, "সার, আপনাকে দেখে ভয় পেয়েছিলাম।"

"তোমার নাম বিমল দুবে?"

"ইয়েস সার।"

"মাখনলাল তোমার ভগ্নিপতি?"

"ইয়েস সার।"

"মাখনলাল যে বলল, তোমার সঙ্গে তার ঝগড়া? তবু তুমি এখানে এসেছিলে কেন?"

"আমার বোনের অসুখ, তার খবর নিতে এসেছিলাম।"

"ঘরের মধ্যে চলো। এবার আসল কথাটা বলো। তুমি ঘুষ খেয়ে হাসপাতালের বন্দিদুটোকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছ?"

"ঘুষ? না, সার, আমাকে কেউ ঘুষটুস দেয়নি। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সেটা আমার অন্যায় হয়ে গেছে। আমার ঘুমের মধ্যে আসামি দুটো পালিয়েছে।"

"তা হলে এই টাকাগুলো এখানে এল কী করে?"

"আমার বোন ওই একই হাসপাতালে আছে। সে বলেছিল, কে যেন তার বিছানায় একটা টাকার বাণ্ডিল ফেলে গেছে। আমার বোন জিজ্ঞেস করেছিল, টাকাটা দিয়ে কী হবে? আমি বলেছিলাম, সে তোমরা যা ইচ্ছে করতে পারো। আমি কিছু জানি না!"

মাখনলাল এবার চেঁচিয়ে বলে উঠল, "মিথ্যে কথা! সার, ও টাকা

আমি ছুঁইনি। কিছুই জানি না। ওই নিশ্চয়ই কখনও এসে টাকাটা এখানে লুকিয়ে রেখে গেছে।"

বিমলও আরও জোরে বলে উঠল, "বাজে কথা! আমি সাত দিনের মধ্যে এ বাড়িতে আসিনি!"

মাখনলাল বলল, "তুই পরশুই এসেছিলি। আমি তখন গোসল করতে গিয়েছিলাম, দরজা খোলা ছিল।"

বিমল আরও কিছু বলতে গেলে কাকাবাবু হাত তুলে বললেন, "চুপ! দু'জনের মিথ্যে কথা বলার প্রতিযোগিতা আমরা দেখতে চাই না। কী হয়েছে, আমরা বুঝে গেছি। বিমল, এই দেয়ালের কাছে এসে দাঁড়াও, আমার দিকে তাকিয়ে থাকো, চোখের পলক ফেলবে না। আমার একটা অন্য খবর জানা দরকার। যা জিজ্ঞেস করছি, সত্যি উত্তর দেবে।"

রফিকুল বললেন, "এখনও মিথ্যে কথা বললে, কী করে সত্যি কথা আদায় করতে হয় তা আমি জানি।"

কাকাবাবু বললেন, "তার দরকার হবে না। মিথ্যে কথার একটা বাজে গন্ধ আছে। আমি সেটা ঠিক টের পাই। বিমল দুবে, এবার বলো, টাকাটা তোমায় কে দিয়েছে?"

বিমল একবার চোখ বুজে, আবার তাকিয়ে বলল, "আমায় কেউ টাকা দেয়নি সার!"

কাকাবাবু নাক কুঁচকে বললেন, "এঃ, বাজে গন্ধ বেরুচ্ছে।"

দেবলীনাও নাক কুঁচকে বলল, "ভীষণ বাজে গন্ধ!"

কাকাবাবু বললেন, "তোমরা কেউ এখন কথা বোলো না। বিমল, তুমি চোখ বুজবে না। আমার দিকে তাকিয়ে থাকো। টাকাটা কে দিয়েছে তোমার হাতে?"

বিমল বলল, "আমার হাতে কেউ টাকা দেয়নি।"

"হাতে দেয়নি, পকেটে গুঁজে দিয়েছে?"

"আমার পকেটে কেউ কিছু দেয়নি।"

"টাকাটা অন্য কোথাও রেখেছে, কিন্তু তোমার জন্যই রেখেছে?"

"বলছি তো, আমি কারও কাছ থেকে টাকা নিইনি!"

"তা হলে এই বারো হাজার টাকা তোমার নয়? মাখনলালের?"

এবারে বিমল দারুণ চমকে উঠল। তারপর মাখনলালের দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে বলল, "মোটে বারো হাজার?"

অন্য সবাই হেসে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, "ঘরটা মিথ্যে কথার দুর্গন্ধে ভরে যাচ্ছিল। এবার সত্যি কথাটা বেরিয়ে এল। টাকাটা যেই আমি কমিয়ে বলেছি, অমনই ওর টনক নড়ে উঠেছে। ওখানে আছে অন্তত পঁচিশ হাজার টাকা। তা হলে বোঝা যাচ্ছে, টাকাটা কেউ বিমলের হাতে বা পকেটে না দিয়ে, বিমলেরই নির্দেশ মতন ওর অসুস্থ বোনের বিছানায় রেখে গেছে। মাখনলাল টাকাটা এনে লুকিয়ে রেখেছে এখানে। সেই টাকাটা আজ নিতে এসেছে বিমল।"

রফিকুল বললেন, "কাকাবাবু, এর পর আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব?"

কাকাবাবু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

রফিকুল বললেন, "শোনো, তোমাকে শুধু সাসপেন্ড করা হয়েছে। এখনও সত্যি কথা না বললে, তোমার চাকরি তো যাবেই, জেল খাটতে হবে। মাখনলালকেও ছাড়া হবে না।"

মাখনলাল বলে উঠল, "সার, ভগবানের দিব্যি করে বলছি, ঘুষের টাকা না কীসের টাকা আমি জানি না। বিমল আমার কাছে রাখতে দিয়েছে। আমার কোনও দোষ নেই।"

রফিকুল বিমলকে জিজ্ঞেস করলেন, "আর কত টাকা বাকি আছে?"

বিমল চুপ।

রফিকুল বললেন, "এসব ঘুষের নিয়ম আমি জানি। প্রথমেই পুরো টাকা দেয় না। আগে আদ্ধেক দেয়, কাজ ঠিকঠাক হয়ে গেলে পরে দেয় বাকিটা। পরে আর কত দেবে?"

বিমল তবু চুপ।

রফিকুল এবার খুব জোরে একটা থাপ্পড় কষালেন ওর গালে।

কাকাবাবু বললেন, "উঁহুঁ, উঁহুঁ, রফিক তুমি নিজে পুলিশ হয়ে আর একজন পুলিশের গায়ে হাত তুলবে, এটা ভাল দেখায় না। আমার হাতে ছেড়ে দাও।"

তিনি এগিয়ে এসে বিমলের কপালে, ঠিক দুই ভুরুর মাঝখানে একটা আঙুল চেপে ধরে বললেন, "আরও আদ্ধেক বাকি আছে, তাই না? এবার মিথ্যে কথা বললে কিন্তু তোমার সাঙ্ঘাতিক পেটব্যথা শুরু হয়ে যাবে। সারা জীবনেও সেই পেটব্যথার অসুখ সারবে না।"

বিমল বলল, "আরও পঁচিশ হাজার।"

"কেউ এসে দিয়ে যাবে?"

"না।"

"তোমাকে গিয়ে আনতে হবে?"

"হ্যাঁ।"

"কবে? কোথা থেকে?"

"পরশুদিন। রাত দশটায়।"

"কোথা থেকে?"

"একটি মেয়ে ... বারাসতে থাকে ... হাসপাতালের পাশে ভাতের হোটেল ..." বিমল আর কিছু বলতে পারল না, ঝুপ করে মাটিতে পড়ে গেল অজ্ঞান হয়ে! সরে এসে কাকাবাবু বললেন, "ওকে নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। মিনিট পাঁচেক বাদেই জ্ঞান ফিরে আসবে। দু'জন অতি সাধারণ কয়েদিকে ছাড়াবার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা

ঘুষ? তা হলেই বুঝতে পারছ, এর পেছনে কতবড় ব্যাপার আছে!"

রফিকুল বললেন, "পরশু, রাত দশটায় একটা ফাঁদ পাততে হবে।"

সন্তু, জোজো, দেবলীনা চুপ করে সব দেখছে। কিন্তু এতক্ষণ চুপ করে থাকা জোজোর স্বভাবে নেই।

সে বলল, "কয়েদি দু'জন তো পালিয়েই গেছে। এর পর যদি বাকি টাকাটা আর না দেয়?"

রফিকুল বললেন, "সাধারণত এইসব অপরাধচক্রের লোকেরা নিজেদের মধ্যে কথার খেলাপ করে না।"

জোজো আবার বলল, "পুলিশ ফাঁদ পাতলেই কি ওরা বোকার মতন ধরা দেবে? বরং কালকেই গিয়ে বারাসতে সেই মেয়েটির খোঁজ করলে হয় না?"

কাকাবাবু বললেন, "জোজো ঠিকই বলেছে। পরশু রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা ঠিক হবে না।"

হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে তিনি বললেন, "কাল কেন, আজই এখন গিয়ে দেখা যেতে পারে। হাসপাতালের পাশে, ভাতের হোটেল, খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে না।"

বিমলের চোখে-মুখে জলের ছিটে দিতেই সে ধড়মড় করে উঠে বসল। ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার মতন বলল, "কী হয়েছে? কী হয়েছে?"

কাকাবাবু বললেন, "অনেক কিছু হয়েছে। আপাতত কয়েকদিন তোমায় থানায় বন্দি থাকতে হবে।"

দেবলীনা এর পরেও বারাসতে যাওয়ার জন্য আবদার ধরল, কাকাবাবু তা গ্রাহ্য করলেন না। জোজোকে বললেন ওকে বাড়ি পৌঁছে দিতে।

তারপর বিমলকে কাছাকাছি একটা থানায় জমা দিয়ে রফিকুলের গাড়ি ছুটল বারাসতের দিকে।

বারাসত হাসপাতালের আশপাশে ওষুধের দোকানই বেশি। ভাতের হোটেল একটি মাত্র। খুঁজে বার করতে অসুবিধে হল না।

রফিকুলের গাড়িটা পুলিশের জিপ নয়, এমনিই সাধারণ অ্যাম্বাসাডর, দেখলে চেনা যাবে না। তবু গাড়িটা রাখা হল খানিকটা দূরে। সন্তু, রফিকুল আর কাকাবাবু হেঁটে এসে ঢুকলেন সেই হোটেলে।

রাত সাড়ে ন'টা বাজে। ভেতরে বেশি ভিড় নেই। একটাই লম্বামতন ঘর, দরজার সামনেই কাউন্টার। সেই কাউন্টারে বসে আছে একজন মহিলা, বয়েস হবে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ, বেশ সপ্রতিভ ভাবভঙ্গি, খদ্দেরদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা সে-ই বুঝে নিচ্ছে।

একটা খালি টেবিল বেছে নিয়ে ওঁরা বসে পড়লেন।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, কী খাবি বল? মফস্বলের এইসব ছোটখাটো হোটেলের রান্না অনেক সময় বেশ ভাল হয়। বাড়ির থেকে অন্যরকম। রফিকুল, এখানেই আমরা ডিনার সেরে নিই, কি বলো?"

রফিকুল বললেন, "কাকাবাবু, আমার দোকানের খাবার ঠিক সহ্য হয় না। আমি বরং না খেলাম।"

কাকাবাবু বললেন, "খাও, খাও, একদিন খেলে কিছু হবে না। পাশের টেবিলে দ্যাখো, বাঁধাকপির তরকারি আর কতবড় পাবদা মাছ খাচ্ছে। আমিও ওই দুটো খাব।"

সন্তু বলল, "আমি খাব মাট্‌ন কারি। আর বেগুনভাজা।"

রফিকুল খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুরগির ঝোল খেতে রাজি হলেন।

একজন লোক এসে অর্ডার নিয়ে গেল।

কাকাবাবু আড়চোখে কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বিমল, এই মহিলাটির কথাই বলেছে মনে হচ্ছে।"

রফিকুল বললেন, "আর ভাতের হোটেল নেই। এখানকার ম্যানেজারও মহিলা, দুটোই মিলে যাচ্ছে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাকাবাবু, এই যে মহিলা হোটেল চালাচ্ছেন, নিশ্চয়ই লাভটাভ হয়। তবু বাচ্চা ছেলে চুরি করার মতন খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়েন কেন? মানুষের কি লোভের শেষ নেই?"

কাকাবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সত্যিই কিন্তু মানুষের লোভের শেষ নেই! টাকার লোভে তারা কত অন্যায়, নিষ্ঠুর কাজ করে, শেষ পর্যন্ত শাস্তিও পায়!"

রফিকুল বললেন, "এ মেয়েটি খুব সম্ভবত এই হোটেলের মালিক নয়, কর্মচারী। বড়-বড় অপরাধচক্রের লোকেরা এইরকম কোনও হোটেল বা দোকান বা অন্য কোনও ব্যবসা খুলে রাখে। কর্মচারীদের দিয়ে কাজ চালায়, নিজেরা থাকে আড়ালে। হোটেলে সবসময় অনেকরকম মানুষজন আসে, এখানে বেআইনি জিনিসপত্র কিংবা টাকাপয়সার লেনদেন করলে কেউ সন্দেহ করবে না। কনস্টেবল বিমলকে তাই এখানে আসতে বলা হয়েছে।"

সন্তু বলল, "মহিলাকে দেখলে বোঝাই যায় না যে ইনি কয়েকটা বাচ্চা ছেলেকে মেরে ফেলার মতন নিষ্ঠুর কাজে রাজি হতে পারেন!"

কাকাবাবু আপন মনে বললেন, "হুঁ, দেখে বোঝা যায় না! আমি একটা অন্য কথা ভাবছি। এই মেয়েটিকে আমরা এখন গ্রেফতার করতে পারব না। কারণ, বিমলের মুখের কথা ছাড়া কোনও প্রমাণ

নেই! ওকে জেরা করতে গেলে সব অস্বীকার করতে পারে। তাতে ওর দলবল সাবধান হয়ে যাবে।”

রফিকুল বললেন, “ওকে এখন ধরা যাবে না। ধরে নিয়ে গেলেও কোনও লাভ হবে না। বাকিরা সবাই গা-ঢাকা দেবে।”

এর মধ্যে বেয়ারা এসে খাবার দিয়ে গেল।

কাকাবাবু বললেন, “আমরা জায়গাটা দেখে গেলাম, আজ এই পর্যন্তই থাক। এবারে খাওয়ায় মন দাও!”

একটুখানি বাঁধাকপির তরকারি মুখে দিয়ে বললেন, “বেশ রেঁধেছে! সবটা খেয়ে নাও, নইলে আমাদেরই ওরা সন্দেহ করবে।”

এর মধ্যে একটা গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল।

তিনটি ছেলে খেয়েদেয়ে দাম না দিয়ে চলে যাচ্ছিল, একজন বেয়ারা চেঁচিয়ে উঠল, “ও দাদা, একাশি টাকা বিল হয়েছে, কাউন্টারে দিয়ে যান!”

ওদের মধ্যে একজন বেয়ারাটিকে এক ধাক্কা মেরে বলল, “ভাগ, বিল কিসের রে! আমরা পাড়ার ছেলে!”

আর একজন ফস করে একটা ছোরা বার করে বলল, “খবর্দার, আমাদের কাছে কখনও পয়সা ফয়সা চাইবে না, তা হলে হোটেল তুলে দেব!”

কাউন্টারের মহিলা ম্যানেজারটি ছোরা দেখে একটুও ভয় পায়নি। কড়া গলায় বলে উঠল, “এই, এখানে মাস্তানি কোরো না। ভাল চাও তো পয়সা দিয়ে দাও!”

ছোরা হাতে ছেলেটি কাউন্টারের কাছে এসে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, “অমন ধমকে কথা বোলো না! অমন ধমকে কথা বলতে নেই! তুমিই বরং একশোটা টাকা ছাড়ো তো! আমাদের সিগ্রেট ফিগ্রেট কিনতে হবে। দাও, দাও, দেরি কোরো না!”

অন্য একটি ছেলে বলল, “দিয়ে দাও গো ময়নাদিদি, এই

হেবোটার খুব মাথা গরম, ঝট করে ছুরি চালিয়ে দেয়।"

হেবো নামে সেই ছোরা হাতে ছেলেটি অন্য খদ্দেরদের দিকে ফিরে বলল, "অ্যাই, যে-যার জায়গায় বসে থাকো, কেউ টুঁ শব্দটি করবে না! কেউ খামোকা মাথা গলাতে এলেই পেট ফাঁসিয়ে দেব!"

কাউন্টারের মেয়েটি এর মধ্যে একটা বেল টিপে দিয়েছে, তাতে ঝনঝন-ঝনঝন শব্দ হতে লাগল।

প্রায় সঙ্গেই-সঙ্গেই রান্নাঘরের দিক থেকে দু'জন লম্বা-চওড়া লোক ছুটে এল, তাদের হাতে লোহার ডাণ্ডা।

তারপর শুরু হয়ে গেল মারামারি।

একটা ব্যাপারে বেশ মজা লাগল সন্তুর।

সে জানে, কাকাবাবু আর রফিকুল আলম, এই দু'জনের কাছেই রিভলভার আছে, শূন্যে একবার গুলি চালালেই সবাই ভয় পেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

কিন্তু ওঁরা দু'জন সেরকম কিছুই করলেন না, খাওয়াও বন্ধ না করে মজা দেখতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত সেই ছেলে তিনটিই হার স্বীকার করল, খোঁড়াতে খোঁড়াতে পালাল দু'জন, আর একজন মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। এদিককার একজন তার জামার কলার ধরে টানতে টানতে কাউন্টারের কাছে এনে বলল, "দে, পয়সা দে!"

সে ছেলেটি বলল, "পঞ্চাশ টাকা দিচ্ছি। আমার কাছে আর নেই। দিব্যি করে বলছি, বাকিটা কাল এসে শোধ করে দিয়ে যাব।"

কাউন্টারের মেয়েটি বলল, "কম টাকা আছে তো হিসেব করে কম খাসনি কেন? আবার যদি কোনওদিন দেখি..."

কাকাবাবু মাথা নিচু করে ফিসফিস করে বললেন, "হোটেল চালানো সোজা নয় দেখছি। ষণ্ডা চেহারার লোক রাখতে হয়। এ মেয়েটিও কম তেজি নয়। চলো, এবার আমরা উঠে পড়ি।"

কাকাবাবুই দাম দেওয়ার জন্য গেলেন কাউন্টারের কাছে। একটু আগে যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে বললেন, "আপনাদের হোটেলের রান্না খুব ভাল। খেয়ে বেশ তৃপ্তি পেলাম।"

মেয়েটি বলল, "আবার আসবেন!"

পরদিন সকালে চা খেতে-খেতে কাকাবাবু সন্তুকে ডেকে বললেন, "কাল সারারাত ভাল করে ঘুমোতে পারিনি। যখনই ভাবছি, কতগুলো সরল, নিষ্পাপ শিশুকে চালান দেবে আরব দেশে, সেখানে বাচ্চাগুলো বেঘোরে মারা যাবে, তখনই আমার গা জ্বলে উঠছে। বাচ্চাগুলোকে পাচার করার আগে যে-কোনও উপায়ে আটকাতে হবে!"

সন্তু বলল, "এর মধ্যেই পাঠিয়ে দিয়েছে কি না, কী করে বোঝা যাবে?"

কাকাবাবু বললেন, "পুলিশকে বলা হয়েছে, এয়ারপোর্টে আর শিয়ালদা-হাওড়ার রেলস্টেশনে কড়া নজর রাখতে। তবু আরও অনেক উপায়ে মুম্বই নিয়ে যেতে পারে। পুলিশের ওপর পুরোপুরি ভরসা করা যায় না। আটকাবার একটা উপায় আমার মাথায় এসেছে। সেজন্য তোকে খানিকটা গোয়েন্দাগিরি করতে হবে, পারবি?"

সন্তু বলল, "কেন পারব না?"

কাকাবাবু বললেন, "কালকের হোটেলের ওই মেয়েটি, ওর সম্পর্কে আরও খোঁজখবর নেওয়া দরকার। কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনই ওকে দিয়ে পেছনের অপরাধচক্রের হদিস পাওয়া দরকার। পুলিশ দিয়ে খোঁজখবর নেওয়াতে গেলেই ওরা সাবধান হয়ে যাবে। পুলিশের ভেতর থেকেই আগে খবর চলে যায়। ওই মেয়েটার নাম বোধ হয় ময়না, তাই না?"

সন্তু বলল, "পাড়ার গুণ্ডারা ময়নাদিদি বলে ডেকেছিল

একবার।”

কাকাবাবু বললেন, “ওর কাছে এক্ষুনি আমার যাওয়া ঠিক হবে না। আমি খোঁড়া মানুষ, ক্রাচ নিয়ে হাঁটি, আমাকে চিনে রাখা সহজ। তুই কাল প্যান্ট-শার্ট পরে গিয়েছিলি, আজ একটা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে যা, দিনের বেলা একটা সানগ্লাসও চোখে দিতে পারিস।”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “কী কী খোঁজ নিতে হবে?”

কাকাবাবু বললেন, “যদি সম্ভব হয়, দেখে আসবি, ওই ময়না কোথায় থাকে। বিয়ে হয়েছে কি না, ছেলেমেয়ে আছে কি না, সে বাড়িতে আর কে কে থাকে। এইগুলো জানাই বেশি দরকার। বেশি বাড়াবাড়ি করিস না, দুপুরের মধ্যে ফিরে আসবি। ইচ্ছে করলে জোজোকেও সঙ্গে নিতে পারিস।”

জোজোকে টেলিফোন করতেই সে সঙ্গে-সঙ্গে রাজি।

সন্তুর সঙ্গে সে দেখা করল হাজরা মোড়ের বাস স্টপে। সেখান থেকে দু'জনে বাসে চেপে এল এসপ্লানেড, তারপর অন্য বাসে বারাসত।

সকালবেলা সেই হোটেলটায় শিঙাড়া-কচুরি-জিলিপি পাওয়া যায়। সন্তু জোজোকে নিয়ে বসল অন্য একটা টেবিলে।

প্রথমেই সে হতাশ হল, কাউন্টারে এখন সেই মহিলাটি নেই, তার বদলে অন্য একজন দাড়িওয়ালা লোক।

জোজো এর মধ্যে সব ব্যাপারটা শুনে নিয়েছে।

প্রথমেই দুটো করে কচুরি আর জিলিপির অর্ডার দিয়ে সে সন্তুকে বলল, “ওয়েট করতে হবে। ওই ময়না নিশ্চয়ই আর একটু পরে আসবে।”

কচুরি-জিলিপি শেষ হয়ে গেল, ময়নার দেখা নেই।

জোজো বলল, “এবারে তা হলে শিঙাড়া টেস্ট করা যাক।”

শিঙাড়া শেষ হতেই বা কতক্ষণ লাগে!

সন্তু বলল, “খাওয়া শেষ হলে কি বেশিক্ষণ বসে থাকা যায়? সেটা খারাপ দেখাবে না?”

জোজো বলল, “খুবই খারাপ দেখাবে। সন্দেহ করতে পারে। পাশের টেবিলে দ্যাখ সন্তু, একজন লোক ওমলেট আর টোস্ট খাচ্ছে। কাকাবাবু বেশি করে টাকা দিয়েছেন তো? আমরাও টোস্ট-ওমলেটের অর্ডার দিয়ে আরও কিছুক্ষণ বসতে পারি।”

সন্তু বলল, “কিন্তু এত খাব কী করে?”

জোজো বলল, “খেতে হবে না। সামনে নিয়ে নাড়াচাড়া করব।”

টোস্ট আর ওমলেট নাড়াচাড়া করতে-করতেই চলে গেল পেটের মধ্যে।

কাউন্টারে এখনও সেই দাড়িওয়ালা পুরুষটি।

এর মধ্যে সবক'টা টেবিল ভরে গেছে। ওদের আর বসে থাকার উপায় নেই।

সন্তু বলল, “মহিলাটির সকালবেলা ডিউটি নেই বোঝা যাচ্ছে। কাউকে জিজ্ঞেস করাও যায় না।

জোজো বলল, “আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। তুই এখানে বসে থাক।”

জোজো উঠে গেল কাউন্টারের কাছে।

দাড়িওয়ালা লোকটিকে বলল, “দাদা, কাল রাত্তিরে আমরা এখানে খেতে এসেছিলাম, ভুল করে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ ফেলে গেছি। তার মধ্যে দামি কিছু নেই, শুধু জরুরি কিছু কাগজপত্র আছে। সেই ব্যাগটা কি আপনারা পেয়েছেন?”

লোকটি জোজোর দিকে না তাকিয়েই বলল, “না, কিছু পাওয়া যায়নি।”

জোজো গলার আওয়াজ খুব করুণ করে বলল, “দাদা, ওর মধ্যে আমার সার্টিফিকেট আছে, না পেলে খুব বিপদে পড়ে যাব। একটু

দেখুন না!"

লোকটি এবার বেল বাজিয়ে একজন বেয়ারাকে ডেকে বলল, "এই ছেলেটি কাল একটা ব্যাগ ফেলে গেছে বলছে, কাল রাত্তিরে, তোরা পেয়েছিস?"

বেয়ারাটি বলল, "আমি তো কিছু পাইনি। কাল রাত্তিরে গোপাল ছিল। কিছু পেলে আমরা তো কাউন্টারে জমা দিই।"

লোকটি জিজ্ঞেস করল, "গোপাল কোথায়?"

বেয়ারাটি বলল, "গোপাল কলকাতায় গেছে।"

জোজো আরও কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, "একটু খুঁজে দেখুন না! দামি কোনও জিনিস নেই, অন্য কেউ নেবে না, কিন্তু খুব দরকারি কাগজপত্র, আমার পরীক্ষার সার্টিফিকেট..."

বেয়ারাটি বলল, "ময়নাবউদি জানতে পারেন।"

দাড়িওয়ালা লোকটি বলল, "ময়নাকে জিজ্ঞেস করে আয় তো!"

বেয়ারাটি বাইরের দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। দু' মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে বলল, "না, ময়নাবউদি ব্যাগ ট্যাগ কিছু পাননি!"

জোজো এমনভাবে কপালে চাপড় মারল, "যেন তার সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

সন্তু উঠে এসে দাম মিটিয়ে দিল, তারপর দু'জনে বেরিয়ে এল বাইরে।

জোজো বলল, "দুটো জিনিস জানা গেল। ময়না থাকে খুব কাছেই কোথাও। আর তার বিয়ে হয়ে গেছে, সে ময়নাবউদি!"

সন্তু বলল, "চল, এবার তার বাড়িটা খুঁজে দেখা যাক।"

বড় রাস্তার ওপর সবই পর পর দোকানঘর। পেছনদিকে কয়েকটা টালির চাল দেওয়া বাড়ি। ওরা দু'জনে অলস ভঙ্গিতে সেই বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে ঘুরতে লাগল। এর মধ্যে ঠিক কোন বাড়িতে

ময়না থাকে, তা বোঝা যাবে কী করে?

এখন অনেক মানুষজন হাঁটছে, ওদের কেউ লক্ষ করছে না।

কয়েকবার চক্কর দিয়েও কিছু বোঝা গেল না।

একটা বাড়ির পেছনদিকে খানিকটা উঠোন মতন ফাঁকা জায়গায় তারের ওপর ভিজে শাড়ি মেলে দিচ্ছে কেউ, একবার একটু ফাঁক দিয়ে দেখা গেল একজন মহিলার মুখ।

সন্তু কনুই দিয়ে জোজোকে খোঁচা মারল।

জোজো এক পলক দেখে নিয়ে ভুরু কাঁপিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই?" অর্থাৎ এই মহিলাই ময়না?

পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে সন্তু আস্তে-আস্তে বলল, "কাকাবাবু যা জানতে চেয়েছিলেন তার অনেকগুলোই জানা হয়ে গেছে। ওর নাম ময়না, থাকে এই বাড়িতে, বিয়ে হয়ে গেছে। বাকি রইল, বাড়িতে আর কে কে থাকে, ওর ছেলেমেয়ে আছে কি না।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু ওর সম্পর্কে এত কিছু জানতে চাইছেন কেন রে?"

সন্তু বলল, "কাকাবাবুর নিজস্ব কিছু সিস্টেম আছে। আগে থেকে বোঝা যায় না। জোজো, তুই এই মহিলার সঙ্গে কথা বলতে পারবি?"

জোজো বলল, "ইজিলি! কারও সঙ্গে ভাব জমাতে আমার এক মিনিটও লাগে না।"

সন্তু বলল, "আমাকে কাল রাত্তিরে দেখেছে, চিনেও ফেলতে পারে। তোকে তো দেখেনি।"

জোজো ফিরে এল মিনিট দশেক পরে।

গর্বের হাসি হেসে বলল, "সব জানা হয়ে গেছে। ময়নার একটা ছেলে, তার নাম কার্তিক, ডাকনাম কাতু, সাত বছর বয়েস, ক্লাস ওয়ানে পড়ে। ওই উঠোনেই সে খেলছে। বাড়িতে এক বুড়ি পিসিমা

ছাড়া আর কেউ নেই। হোটেলের কাউন্টারের দাড়িওয়ালা লোকটিই ময়নার স্বামী। তবে, ওরা হোটেলটার মালিক নয়। দু'জনেই চাকরি করে।"

সন্তু রীতিমতন অবাক হয়ে বলল, "তুই এতসব কথা জিজ্ঞেস করলি?"

জোজো বলল, "আমারও নিজস্ব সিস্টেম আছে। তোকে বলব কেন? এবার আর কী করতে হবে বল?"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু তো শুধু এগুলোই জানবার জন্য পাঠিয়েছেন। আর কিছু দরকার নেই।"

জোজো বলল, "এবার আমরা হোটেলের মালিকেরও খোঁজ করতে পারি।"

সন্তু বলল, "তার দরকার নেই!"

জোজো বলল, "ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, খুঁজে বার করব?"

সন্তু বলল, "আমাদের যেটুকু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেটা আমরা সেরে ফেলেছি। বেশি বাড়াবাড়ি করার তো দরকার নেই। ওরা টের পেয়ে গেলে বাচ্চাগুলোকে মেরে ফেলতে পারে।"

জোজো বলল, "জানিস সন্তু, আমার বাবার কাছে এমন একটা ওষুধ আছে, যেটা খাইয়ে দিলে যে-কোনও মানুষ গড়গড় করে তার সব পাপের কথা স্বীকার করে ফেলে। এই ময়নাকে যদি সেই ওষুধটা খাওয়ানো যায়, ও দলের সব্বার কথা বলে দেবে।"

সন্তু বলল, "আমার ধারণা, এই ময়না বিশেষ কিছু জানে না। ওর হাত দিয়ে শুধু ঘুষের টাকাটা দেওয়াচ্ছিল। শুধু পুঁচকে দুটো কয়েদিকে ছাড়াবার জন্য বিমল দুবেকে অত টাকা ঘুষ দিতে চেয়েছিল কেন, সেটাই বোঝা যাচ্ছে না।"

জোজো বলল, "বিমল দুবে নিশ্চয়ই আরও অনেক খবর টবর

ওদের দিত। ও অনেক কিছু জানে।"

সন্তু বলল, "তা হলে বিমল দুবেকেই তোর বাবার ওষুধটা খাওয়ালে হয়।"

জোজো বলল, "ঠিক বলেছিস। ও তো হাতের কাছেই আছে। দেখিস, এবার আর কাকাবাবুকে বিশেষ কিছু করতে হবে না। আমিই এই ক্রিমিনাল গ্যাঙটার সবক'টাকে ধরার ব্যবস্থা করে ফেলব!"

অমূল্য নামে একটা ছেলে, তার ডাকনাম রজ্জু, একবার রেল ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। কাকাবাবু সেই সময় সেই ট্রেনের কামরায় ছিলেন। ছেলেটিকে ভাল পথে ফিরিয়ে আনার জন্য কাকাবাবু পুলিশকে বলে টলে তাকে ছাড়িয়ে আনেন, তাকে একটা চাকরি জুটিয়ে দেন। কিন্তু সে সহজে ভাল হতে চায় না। কিছু একটা চুরিটুরি করে ফেলে, তাতে তার চাকরি যায়। এর মধ্যে তিন-চারবার এ রকম হয়েছে। প্রতিবার চাকরি গেলেই সে কাকাবাবুর কাছে এসে পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্ষমা চায়।

ছেলেটির ওপর কাকাবাবুর মায়া পড়ে গেছে, তিনি ওকে ক্ষমা করে আবার ঢুকিয়ে দেন অন্য চাকরিতে।

আজ কাকাবাবু তাকে টেলিফোনে ডেকে এনেছেন।

রজ্জু কাকাবাবুর কাছে এসে কক্ষনও চেয়ারে বা সোফায় বসে না। মাটিতে বসে হাত জোড় করে থাকে। কাকাবাবু অনেক বকে-বকেও তার এই স্বভাব ছাড়াতে পারেননি।

রজ্জুর বয়েস ছাব্বিশ-সাতাশ বছর, বেশ লম্বা, পেটানো চেহারা, খাকি প্যান্টের ওপর একটা কালো ডোরাকাটা জামা পরা। মাথার চুল ঘাড় ছাড়িয়ে গেছে। তাকে চা খেতে দেওয়া হয়েছে, সে দু'হাতে কাপটা ধরে চুমুক দিচ্ছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ওহে রজ্জু, এবারের চাকরিটা তোমার আর ক'দিন টিকবে?"

রজ্জু বলল, "এবারে টিকে যাবে। আর কোনও গোলমাল হবে না সার।"

কাকাবাবু বললেন, "যা মাইনে পাও, তাতে সংসার খরচ চলে যায়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ সার। মোটামুটি চলে যায়। বাড়িতে বুড়ো বাবা-মা আছেন, তাঁদের জন্যই তো চাকরি করা।"

"আগের চাকরিটা তো আরও ভাল ছিল। মাইনে বেশি ছিল। তবু সেখানেও চুরি করতে গেলে কেন?"

"ওই যে বলে না সার, 'অভাব যায় না মলে, স্বভাব যায় না ধুলে!' ছেলেবেলা থেকেই বাজে লোকদের সঙ্গে মিশে ওই স্বভাব হয়ে গেছে। মাঝে-মাঝে হাত সুলসুল করে। তবে, এবারে আমি সামলে নিয়েছি সার, নিজের হাতকে নিজেই ধমকাই!"

"চুরি ডাকাতি করলে যে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তে হয়, শাস্তি পেতে হয়, এটা কেন ভাবো না?"

"কী যে বলেন সার! ও-কথা যদি সবাই ভাবত, তা হলে তো গোটা পৃথিবী থেকে চুরি-ডাকাতি উঠেই যেত। জেলখানা কিংবা পুলিশ রাখার দরকারই হত না।"

"তা ঠিক। রেল-ডাকাতির সময় তোমার যেসব সঙ্গী-সাথী ছিল, তাদের কোনও খবর রাখো?"

"দু'জন জেলে পচছে। একজন পুলিশের গুলি খেয়ে পটল

তুলেছে। আর কয়েকজন এখনও ছুটকো-ছাটকা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।"

"তাদের সঙ্গে তোমার দেখা হয়?"

"আমি দেখা করতে চাই না, তারাই আমার পেছনে ঘুরঘুর করে। আমায় কু-মতলব দেয়। বলে কি, রজ্জু, তুই ওইসব বাঁধা মাইনের চাকরি কতদিন চালাবি? আমাদের দলে ফিরে আয়। একটা বড় দাঁও মারতে পারলে একসঙ্গে অনেক টাকা হাতে আসবে, আরামসে থাকতে পারবি! আমি তাদের বলি, ভাগ, ভাগ, আমি আর ওসব লাইনে যেতে চাই না। পুলিশের পিটুনি খেলেই সব আরাম ঘুচে যাবে। তা ছাড়া লুটের জিনিসের ভাগ নিয়ে ঝগড়া, খুনোখুনি পর্যন্ত হয়! আমি এখন বেশ আছি।"

"তোমার ওই সঙ্গী-সাথীদের দিয়ে আমি একটা কাজ করাতে চাই। একটা বাচ্চা ছেলেকে চুরি করে আনতে হবে।"

রজ্জুর মুখের হাঁ-টা অনেক বড় হয়ে গেল।

চোখ গোল গোল করে বলল, "আমি কি নিজের কানে ভুল শুনছি? আপনি কী বললেন সার? একটা ছেলেকে চুরি করে ধরে আনতে হবে?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "ঠিকই শুনেছ। একটা ছেলেকে আমার চাই। বেশি না, এ-কাজের জন্য আমি হাজার দু-এক টাকা দেব।"

রজ্জু বলল, "আপনি যখন বলছেন, টাকার কোনও কোশ্চেনই নেই। আপনার জন্য জান দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আপনি ছেলে চুরি করতে বলছেন কেন সার?"

"তা তোমাদের এখন জানার দরকার নেই। কাজটা কি খুব শক্ত?"

"মোটেই না, মোটেই না। একটা বাচ্চাকে তুলে আনা আর এমন কী ব্যাপার। তারপরে লুকিয়ে রাখাটাই শক্ত। বাচ্চারা চ্যাঁ-ভ্যাঁ করে

কাঁদে, পাড়ার লোক জেনে যায়, তারাই পুলিশে খবর দেয়, তখন জায়গা পালটাতে হয়। অত হ্যাপা পোষায় না বলেই ও লাইনে বিশেষ কেউ যায় না।”

“তোমাদের সে ঝামেলা পোহাতে হবে না। বারাসত হাসপাতালের কাছে একটা ভাতের হোটেল আছে। সেখানে কাজ করে ময়না দাস। কাছেই তার বাড়ি। সেই ময়নার ছেলে কার্তিককে তুলে আনতে হবে। আমার এক ডাক্তার বন্ধুর নার্সিং হোম আছে বেহালায়, ছেলেটাকে সেখানে পৌঁছে দেবে। তারপর আর তোমাদের কোনও দায়িত্ব নেই। কতদিন সময় লাগবে?”

“অন্তত দুটো দিন সময় দিন সার।”

দু'দিনও লাগল না। পরদিন বিকেলেই রজ্জু এসে বলল, “কাজ হয়ে গেছে সার। নো গণ্ডগোল। বাচ্চাটাকে নার্সিং হোমে পৌঁছে দিয়েছি।”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কান্নাকাটি করেছে নাকি?”

রজ্জু বলল, “ঘুমের ওষুধ মেশানো লজেঞ্চুস খাওয়ানো হয়েছে তো, এখনও ঘণ্টা তিনেক ঘুমোবে। তারপর খানিকটা তো চেল্লাবেই। সে ডাক্তারবাবু বুঝবেন।”

কাকাবাবু বললেন, “বেশ। তোমার বন্ধুদের বোলো, কোনও খারাপ উদ্দেশ্যে ছেলেটাকে চুরি করে আনা হয়নি। ভাল কাজের জন্যই। আর ওইসব বন্ধুরা যদি চুরি-ডাকাতি ছেড়ে সৎপথে আসতে চায়, আমি তাদের চাকরি জোগাড় করে দিতে পারি। এখন তোমার শুধু আর একটা ছোট কাজ বাকি আছে। আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, এই চিঠিটা ময়না দাসের বাড়িতে গোপনে ফেলে দিয়ে আসবে।

কাকাবাবু লিখলেন :

কার্তিক নামে একটি বাচ্চা ছেলে আমার হেফাজতে আছে। সে

নিজের নাম আর বাবা-মায়ের নাম বলতে পারে, কিন্তু ঠিকানা বলতে পারে না। যদি আপনাদের সন্তান হয়, উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারেন। আমার ঠিকানা লেখা আছে প্যাডের ওপরে। সকাল ন'টা থেকে বারোটা পর্যন্ত সাক্ষাতের সময়। ছেলেটি ভাল আছে।

ইতি

রাজা রায়চৌধুরী

চিঠিখানা নিয়ে রজ্জু চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু মনের আনন্দে গান ধরলেন গুনগুনিয়ে।

সন্তু বাড়িতে নেই। এই সময় সে সাঁতার কাটতে যায়।

বেহালার নার্সিং হোমে ফোন করে ডাক্তার বন্ধুটির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেন কাকাবাবু।

ডাক্তার নরেন সেন বললেন, "ছেলেটিকে আমার কাছে পাঠিয়ে ভালই করেছ রাজা। এ তো দেখছি হুপিং কাশিতে ভুগছে। ঘুমের মধ্যেও কাশছে। ক'দিন চিকিৎসা করে সারিয়ে দেব।"

কাকাবাবু বললেন, "দেখো, যেন পালিয়ে না যায়। আমি তোমার নার্সিং হোমে যাব না, কারণ আমাকে ওরা ফলো করতে পারে। তুমি ওর যত্ন করবে, জানি!"

এর পর শুধু অপেক্ষা। চিঠিটা পাওয়ার পর ময়না দাস আর তার স্বামী কী করে, সেটা দেখতে হবে।

পরদিন সকালে তারা এল না।

রফিকুল ফোনে একটা খারাপ খবর দিলেন।

গঙ্গার ধারে ট্রেন লাইনে কনস্টেবল বিমল দুবের মৃতদেহ পাওয়া গেছে।

রফিকুল বললেন, "দেখে মনে হবে, ট্রেনে কাটা পড়েছে। কিন্তু অন্য জায়গায় খুন করে ট্রেন লাইনে ফেলে দেওয়াও হতে পারে।

সেটাই বেশি সম্ভব। তবে ট্রেনের চাকায় লাশটা এমন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে যে আর কিছু বোঝার উপায় নেই।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "থানা থেকে ও বাইরে গেল কী করে?"

রফিকুল বললেন, "আপনি তো দেখলেন, ওকে হাজতে আটকে রাখতে বলেছিলাম! অন্য পুলিশদের সঙ্গে চেনাশোনা, কিছু একটা ছুতো করে বেরিয়ে পড়েছিল নিশ্চয়ই।"

কাকাবাবু কয়েক মুহূর্ত থেকে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "লোকটা বড় বেশি লোভী ছিল, ঘুষের বাকি টাকাটা আদায় করবার জন্যই বেরিয়েছিল। বেঘোরে প্রাণটা দিল। বুঝতেই পারছ, একটা খুব শক্তিশালী চক্র কাজ করছে। সেই চক্রের একটামাত্র সূত্র ওই ময়না দাস নামে মেয়েটি। তাও সে কতখানি জড়িত, আমরা এখনও জানি না। ওই ভাতের হোটেল আর ময়না দাসের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।"

রফিকুল বললেন, "তা অবশ্যই করব। তবে মুশকিল হচ্ছে, এই কেসটায় আমি তেমন সময় দিতে পারছি না। আমাকে ব্যাঙ্ক-ডাকাতদের নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। কালও আবার সোনারপুরে একটা ব্যাঙ্ক-ডাকাতি হয়েছে। খবরের কাগজে খুব লেখালেখি হচ্ছে এই নিয়ে। আমি একটাকে ধরেছি, বাকি পুরো গ্যাঙটাকে জালে ফেলতে না পারলে আমার শান্তি নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি থাকো তোমার ব্যাঙ্ক-ডাকাতদের নিয়ে। খুনি আর ডাকাতদের ধরা পুলিশের কাজ, সেসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না আমি। বাচ্চাগুলোকে কীভাবে উদ্ধার করা যায়, আমি সেই চিন্তা করছি।"

রফিকুল বললেন, "কাকাবাবু, আমাকে ভুল বুঝবেন না। বাচ্চাগুলোকে তো উদ্ধার করতেই হবে, এই ব্যাঙ্ক ডাকাতগুলোও

বড্ড জ্বালাচ্ছে। আপনাকে সব ব্যাপারে সাহায্য করতে আমি সব সময় রাজি আছি। বরুণ মজুমদার নামে একজন ইয়াং অফিসারকে আপনার কাছে পাঠাব? সে সবসময় আপনার সঙ্গে থাকতে পারবে।"

কাকাবাবু বললেন, "আপাতত তার দরকার নেই।"

ফোন রেখে তিনি খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন।

সোনারপুরে ব্যাঙ্ক-ডাকাতির খবর প্রথম পাতাতেই বড় করে ছাপা হয়েছে। অন্য কোনও পৃষ্ঠায় তন্নতন্ন করে খুঁজেও তিনি বাচ্চাগুলির কোনও খবর দেখতে পেলেন না। সে খবর চাপা পড়ে গেছে।

বিরক্তিতে তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল।

কতগুলো বাচ্চাছেলের জীবনের চেয়ে কি টাকার দাম বেশি?

বাচ্চাগুলোকে যদি মুম্বই পর্যন্ত পাচার করে দেয়, তা হলে আর তাদের হদিস করা মুশকিল হবে। সেখান থেকে তাদের তুলে দেওয়া হবে কোনও আরব দেশের জাহাজে।

কাকাবাবু মনে মনে ঠিক করলেন, দরকার হলে তিনি আরব দেশেও যাবেন। উটের দৌড়ের নিষ্ঠুর খেলাটাই বন্ধ করে দিতে হবে। চিঠি লিখতে হবে রাষ্ট্রসঙ্ঘে।

এক সময় তাঁর চোখ বুজে এল। তন্দ্রার মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন, মরুভূমির মধ্যে উটের দৌড় চলছে, প্রত্যেকটা উটের ওপর এক-একটা বাচ্চা ছেলে, তারা প্রাণের ভয়ে চিৎকার করছে। একটা বাচ্চা উটের পিঠ থেকে ছিটকে পড়ে গেল, মাটিতে পড়ার আগেই কাকাবাবু তাকে লুফে নিলেন। তাকে আদর করতে করতে তিনি বলতে লাগলেন, ভয় নেই, আর ভয় নেই। তাঁর মুখে বাংলা কথা শুনে বাচ্চাটি কান্না থামিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

বিকেলবেলা সিঁড়ি দিয়ে দুপদাপ করে শব্দ করে ঘরে এসে ঢুকল

দেবলীনা।

ঢুকেই জিজ্ঞেস করল, "সন্তু কোথায়?"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু আজ কলেজে গেছে।"

দেবলীনা বলল, "পৌনে পাঁচটা বাজল, এখনও ফেরেনি কেন? নিশ্চয়ই বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে।"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা খারাপ কিছু নয়। কলেজে পড়বে আর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেবে না, তা কি হয়? তুমিও যখন কলেজে যাবে—"

দেবলীনা বলল, "আমি মোটেই কলেজে পড়ব না। আমি ডাক্তারি পড়ব!"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "সেটাও তো কলেজ। ডাক্তারির ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝি আড্ডা দেয় না?"

একটা চেয়ার টেনে কাকাবাবুর ঠিক সামনে মুখোমুখি বসে দেবলীনা জিজ্ঞেস করল, "তারপর কী হল?"

কাকাবাবু ওর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "তোমার চোখ দুটো ছলছল করছে কেন? জ্বর হয়েছে নাকি?"

দেবলীনা এক হাত নেড়ে বলল, "ও কিছু না!"

কাকাবাবু ঝুঁকে ওর কপালে হাত দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, বেশ জ্বর দেখছি! কখন থেকে হল?"

"খবর্দার! কাউকে কিছু বলতে পারবে না।"

"কী বলব না?"

"এই জ্বরের কথা। আমার বাবাকে বলবে না, প্রতিজ্ঞা করো!"

"এরকম প্রতিজ্ঞা করতে হবে কেন?"

"আজ সন্ধেবেলাই বাবাকে প্লেন ধরে ব্যাঙ্গালোর যেতে হবে। অফিসের কাজে। আমার জ্বর শুনলে যেতে চাইবেন না, তাতে কাজ নষ্ট হবে। জ্বর তো মানুষের হয়ই, আবার সেরে যায়। সামান্য জ্বরের

জন্য বাবার কাজ নষ্ট করতে হবে কেন?"

"তা ঠিক। জ্বরের জন্য বেশি ব্যস্ত হওয়া ঠিক নয়। তবে জ্বর বাড়লে ওষুধ খেতে হবে। আমি ওষুধ দিয়ে দেব। বাড়িতে তোমার পিসিমা আছেন?"

"হ্যাঁ আছেন। পিসিমার সঙ্গে আজ আমার খুব ঝগড়া হয়েছে।"

"কার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয় না? শুধু আমার সঙ্গেই বাকি আছে।"

"তারপর কী হল বলো!"

"তারপর মানে, কার পর?"

"সেই যে সেদিন তোমরা বারাসত চলে গেলে, আমাকে সঙ্গে নিলে না। সেখানে কী হল?"

"তুমি পাবদা মাছ খাও?"

"কাকাবাবু, কী আজেবাজে কথা বলছ? পাবদা মাছ আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। চিংড়ি ছাড়া আমি কোনও মাছই খাই না। কিন্তু হঠাৎ মাছের কথা এল কেন?"

দেবলীনার রাগমাখানো মুখটা দেখে কাকাবাবু জোরে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, "বাঃ, তুমিই তো জানতে চাইলে। বারাসতের ভাতের হোটেলে গিয়ে আমি পাবদা মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেলাম। সন্তু খেল মাংস-ভাত। বেশ ভাল রান্না করে।"

দেবলীনা নাক কুঁচকে বলল, "ওসব হোটেলগুলো খুব নোংরা হয়। তারপর? তারপর?"

কাকাবাবু বললেন, "তারপর আমরা ফিরে এলাম।"

"তার মানে?"

"খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা ফিরে এলাম।"

"আর কোনও খোঁজখবর পেলে না?"

"নাঃ! হোটেলে আর কী খোঁজ পাওয়া যাবে?"

"কাকাবাবু, তুমি খুব বাজে ডিটেকটিভ!"

"তা তো বটেই! ডিটেকটিভগিরি আমার দ্বারা হবেই না। আমি আধখানা পায়ের ছাপ দেখে বলতে পারব না, খুনি বেঁটে না লম্বা। পোড়া দেশলাইকাঠি দেখে বলতে পারব না, ডাকাতটার দাড়ি আছে কি না!"

"আমাকে সঙ্গে নিলে আমি ঠিক বুঝে যেতাম, বাচ্চাগুলোকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। বিচ্ছিরি পাবদা মাছও খেতে হত না।"

"এর পরের বার তোমাকে সঙ্গে নিতেই হবে।"

এই সময় সন্তু এসে উঁকি মারল দরজার কাছে।

কাকাবাবু বললেন, "এই তো সন্তু এসে গেছে। তোমরা ওপরে গিয়ে গল্প করো। আমাকে কয়েকটা চিঠি লিখতে হবে। তবে আজ বেশি দেরি কোরো না, দেবলীনা, তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যেও। সন্তু, তুই বরং আজ ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসিস।"

দেবলীনা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, "কেন, আমাকে পৌঁছে দিতে হবে কেন? আমি কি কচি খুকি নাকি?"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে। পৌঁছে না দিলেও সন্তু তোমাকে বাসে তুলে দেবে!"

দেবলীনা বলল, "না, আমাকে বাসেও তুলে দিতে হবে না। আমি একলা এসেছি, একলাই যেতে পারি।"

ওরা ওপরে চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু চিঠি লেখায় মন দিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে দু'জন অতিথি এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। রঘু তাঁদের পৌঁছে দিয়ে গেল ওপরে।

এঁদের মধ্যে একজন তুরস্কের রাষ্ট্রদূত আল ফারুকি, অন্যজন তাঁর দেহরক্ষী। আল ফারুকি দিল্লি থেকে কখনও কলকাতায় এলেই কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করেন। তিনদিন আগে জানিয়েছিলেন তাঁর আসবার কথা।

আল ফারুকি দীর্ঘকায়, সুদর্শন পুরুষ। খুব পণ্ডিত লোক, গ্রিক ও সংস্কৃত ভাষা জানেন। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ বিষয়ে কিছু নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন, তাই নিয়ে আলোচনা করতে এসেছেন কাকাবাবুর সঙ্গে।

কিছুক্ষণ সে বিষয়ে কথা হওয়ার পর কাকাবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, "আচ্ছা, আল ফারুকি সাহেব, আপনাদের ওদিকে উটের পিঠে বাচ্চা ছেলেদের বসিয়ে দৌড় করাবার যে নিষ্ঠুর খেলা আছে, সেটা বন্ধ করতে পারেন না?"

একটুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে আল ফারুকি ধীর স্বরে বললেন, "আমাদের টার্কিতে ও খেলা হয় না। আরবের অন্য দু'-একটি দেশে এই বর্বর খেলা এখনও হয় শুনেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনাদের দেশ অনেক ব্যাপারেই খুব উন্নত আমি জানি। অন্য যে-দেশে এসব এখনও চলছে, সেখানেও বন্ধ করার জন্য আপনারা তো চাপ দিতে পারেন।"

আল ফারুকি বললেন, "হ্যাঁ, চেষ্টা করা উচিত।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের দেশ কিংবা বাংলাদেশের মতন গরিব দেশ থেকেই তো এইসব হতভাগ্য বাচ্চাদের চালান দেওয়া হয়। তার জন্য অবশ্য আমাদের দেশের কিছু অতি পাজি ও বদমাইশ লোকই দায়ী। প্রয়োজন হলে আমি আরব দেশে যাব ভাবছি।"

আল ফারুকি বললেন, "আসুন, আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব।"

তিনি চলে যাওয়ার পর নীচ থেকে খাবারের ডাক এল।

কাকাবাবু দরজার কাছে যেতেই বেজে উঠল ফোন।

ফিরে এসে ফোন ধরতেই শুনতে পেলেন, একজন কেউ কর্কশ গলায় বলল, "রাজা রায়চৌধুরী? দেবলীনা নামের মেয়েটি

আমাদের কাছে আছে। তুমি আগে কার্তিককে বারাসতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করো, তারপর তাকে ফেরত পাবে। তোমাকে ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম!"

কাকাবাবু কিছু বলার আগেই লাইন কেটে গেল।

কাকাবাবু যেন বুকে একটা আঘাত পেলেন, ফ্যাকাসে হয়ে গেল তাঁর মুখ।

তিনি বুঝতে পারলেন, তিনি সাঙ্ঘাতিক ভুল করে ফেলেছেন।

কার্তিক নামের ছেলেটিকে হঠাৎ চুরি করে আনা ঠিক হয়নি। ওরা অত্যন্ত শক্তিশালী। আঘাতটা যে এইদিক থেকে আসবে, তিনি কল্পনাও করতে পারেননি।

দেবলীনার বদলে সন্তুকে ধরে নিয়ে গেলে তিনি মোটেই চিন্তিত হতেন না।

দেবলীনাকে কখন ধরল? এ বাড়ি থেকে বেরোবার সময়? নিশ্চয়ই ওরা এ-বাড়ির ওপর নজর রেখেছে! মেয়েটা মোটেই কথা শোনে না, সন্তু যদি ওর সঙ্গে যেত, তা হলে হয়তো দেবলীনার বিপদ হত না।

আল ফারুকির সঙ্গে যখন তিনি কথা বলছিলেন, তার মধ্যে দেবলীনা কখন বেরিয়ে গেছে, তিনি খেয়ালও করেননি। মেয়েটার জ্বর, ওষুধ খায়নি। ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে কত কষ্ট দেবে তা কে জানে!

নিজের ওপরেই এত রাগ হল কাকাবাবুর যে, ইচ্ছে হল গালে চড় মারতে!

একবার হঠাৎ মনে হল, টেলিফোনে লোকটা মিথ্যে ভয় দেখায়নি তো?

দেবলীনার বাড়িতে তিনি ফোন করলেন।

না, মিথ্যে নয়। দেবলীনা বাড়ি ফেরেনি। দেবলীনার বাবা আগেই

এয়ারপোর্ট চলে গেছেন। পিসিমা এইসব খবর জানালেন।

কাকাবাবু বললেন, "আপনি চিন্তা করবেন না। দেবলীনা আমার সঙ্গেই আছে। রাত্তিরে এখানেই থাকবে। দু'-একদিন আমার কাছেই থাকবে বলেছে। পরে আপনাকে জানাব।"

ফোন রেখে কাকাবাবু একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন।

ক্রমশ তাঁর রাগ বাড়ছে। গরম নিশ্বাস বেরোচ্ছে ঘন ঘন।

এইরকম সময় তাঁর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। দুনিয়ার কোনও বিপদকেই গ্রাহ্য করেন না তিনি। দেবলীনাকে উদ্ধার করার জন্য তিনি এক মুহূর্তও নষ্ট করতে রাজি নন।

রিভলভারটা পকেটে নিয়ে তিনি নেমে এলেন নীচে।

অন্য সবাই খেতে বসে গেছে। কাকাবাবু মুখ বাড়িয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, "আমি আজ খাব না। বিশেষ কাজে আমাকে বেরোতে হচ্ছে এক্ষুনি।"

সন্তু কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই কাকাবাবু বেরিয়ে গেলেন।

ট্যাক্সি থেকে নেমে কাকাবাবু দেখলেন, ভাতের হোটেলটি বন্ধ হয়ে গেছে। দরজা বন্ধ।

রাস্তা পেরিয়ে এসে তিনি দরজাটা ঠেলতেই সেটা খুলে গেল।

ভেতরে একটামাত্র আলো জ্বলছে টিমটিম করে। হোটেলেরই দু-তিনজন কর্মচারী বসে খাচ্ছে আর গল্প করছে নিজেদের মধ্যে।

কাকাবাবুকে ঢুকতে দেখে একজন বলে উঠল, "এখন কিছু পাওয়া যাবে না। বন্ধ হয়ে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে!"

কাকাবাবু তবু ক্রাচ খটখটিয়ে এগিয়ে এসে গম্ভীরভাবে সেই লোকটিকে বললেন, "আমার নাম রাজা রায়চৌধুরী, আমি ময়নার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি!"

লোকটি খাওয়া থামিয়ে কয়েক মুহূর্ত অবাক ভাবে কাকাবাবুর দিকে চেয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কী নাম বললেন আপনার?"

কাকাবাবু আবার বেশ জোরে নিজের নাম উচ্চারণ করলেন।

লোকটি পেছন ফিরে কাউকে ডেকে বলল, "অনন্ত, অনন্ত, কে এসেছে দ্যাখো, বড় মালিককে খবর দাও!"

সেদিকের দরজা খুলে একজন লোক বেরিয়ে এল।

কাকাবাবু তাকে চিনতে পারলেন। আগের দিন এই লোকটি লোহার ডাণ্ডা দিয়ে পাড়ার বখাটে ছেলেদের পিটিয়েছিল। আজও তার হাতে একটা ডাণ্ডা আছে।

কাছে এসে সে বলল, "আসুন আমার সঙ্গে।"

পেছনদিকে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়।

সেখানে এসে লোকটি কাকাবাবুকে ওপরে ওঠার ইঙ্গিত করতেই তিনি বললেন, "তুমি আগে আগে-ওঠো।"

লোকটি ভুরু কুঁচকে একবার তাকাল, কিন্তু আপত্তি করল না।

ওপরে একটি অফিসঘর। সাধারণ একটা ভাতের হোটেলের এমন সাজানো-গোছানো অফিসঘর আশা করা যায় না। খুব দামি সোফা আর চেয়ার-টেবিল। দু'জন লোক সেখানে বসে আছে পাশাপাশি, একজন পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, আর একজনের নিখুঁত সুট-টাই, থুতনিতে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, দু' হাতের আঙুলে অনেক আংটি। দু'জনেই মাঝবয়েসি।

আংটি পরা লোকটি কাকাবাবুর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে বলল, "আপনিই রাজা রায়চৌধুরী? নমস্কার। আমিই আপনাকে ফোন

করেছিলাম। আমি চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছিলাম, আপনি বেশ তাড়াতাড়ি এসে পড়েছেন তো! বসুন!"

কাকাবাবু ওদের মুখোমুখি বসে বললেন, "হ্যাঁ, দেরি করে লাভ কী? আপনি আমার নাম জানেন, আপনার নাম কী?"

লোকটি বলল, "আমার নাম জানার দরকার কী? কাজের কথা শুরু হোক। আপনি একা এসেছেন কেন? কার্তিক কোথায়?"

কাকাবাবু বললেন, "সে ভাল জায়গাতেই আছে। কিন্তু আমার কথা আপনারা যদি মেনে না চলেন, তা হলে ত কিছুতেই খুঁজে বার করতে পারবেন না।"

লোকটি ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসে বলল, "আমরা কী পারি আর না পারি, সে সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণাই নেই।"

হঠাৎ দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ময়না।

কাকাবাবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিল চড় মারতে-মারতে বলল, "হারামজাদা। শয়তান! কার্তিককে কেন আনিসনি! আমার কার্তিকের গায়ে যদি একটা আঁচড় লাগে, তোকে গলা টিপে মেরে ফেলব! কোথায় কার্তিক? বল, বল!"

সে কাকাবাবুকে মারছে আর কাঁদছে।

কাকাবাবু একটুও বাধা দিলেন না।

ওই দু'জন লোক ময়নাকে জোর করে সরিয়ে নিল। ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মতন ফুঁসতে লাগল সে।

কাকাবাবু তার চোখের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন, "তোমার ছেলেকে কেউ ধরে নিয়ে গেছে, তাই তোমার এত কষ্ট হচ্ছে। সব মায়েরই হয়। বাংলাদেশ থেকে যে বাচ্চাদের চুরি করে এনেছ, তাদের মায়েদের কি একই অবস্থা হয়নি? তুমি নিজে মা হয়ে তাদের কষ্ট বোঝো না?"

ময়না খানিকটা হকচকিয়ে গিয়ে বলল, "কে ছেলে চুরি করে

এনেছে? বাজে কথা। মিথ্যে কথা। আমি তো কিছুই জানি না।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি এদের চেনো? এদের জিজ্ঞেস করে দ্যাখো। তুমি এখানে একা কাঁদছ, ওখানে দশ-বারোজন মা কাঁদছে। এদের বলো সবক'টা বাচ্চাকে ফেরত দিতে, না হলে কিন্তু তোমার কার্তিককে আর কোনওদিনই তুমি দেখতে পাবে না।"

ময়না আবার ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, "আমার কার্তিককে এক্ষুনি ফেরত দাও, তার শরীর ভাল না, কাশির অসুখ।"

আংটি পরা লোকটি ধমক দিয়ে বলল, "এই ময়না, চুপ কর! অনন্ত, একে বাইরে নিয়ে যাও!"

ডাণ্ডা হাতে লোকটি বাইরেই অপেক্ষা করছিল, সে এসে ময়নাকে টানতে-টানতে নিয়ে গেল জোর করে। ময়না তখনও ছটফটিয়ে কাঁদছে।

আংটি-পরা লোকটি এবারে একটা সিগারেট ধরিয়ে চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, "রাজা রায়চৌধুরী, আমি আগে আপনার সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। আজ অনেক খোঁজখবর নিয়েছি। আপনি তো পুলিশের লোক নন? আপনি আমাদের ব্যাপারে মাথা গলাতে এসেছেন কেন? এসব লাইন তো আপনার নয়। আপনার তো পাহাড়-জঙ্গলে গিয়ে ভূত তাড়া করার কথা।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি পুলিশের লোক নই, কিন্তু আমি মানুষ। তোমাদের মতন অমানুষ নই। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা কষ্ট পাচ্ছে শুনলে আমার কষ্ট হয়। শুধু কষ্ট নয়, মাথা গরম হয়ে ওঠে।"

আংটি পরা লোকটি বলল, "উঁহুঁ, মাথা গরম করা মোটেই ভাল নয়। মাথা গরম করেই তুমি হুট করে এখানে চলে এসেছ! কাজটা মোটেই ভাল করোনি। এখান থেকে কী করে ফিরে যাবে, সে চিন্তা

করোনি!"

পাশের লোকটি এবারে বলে উঠল, "আরে ওস্তাদ, এর সঙ্গে তুমি এত ধানাই পানাই করছ কেন? সাফ-সাফ কথা বলে দাও। ময়নার ছেলেটাকে ফেরত না দিলে ওর ওই মেয়েটার একটা হাত কেটে ফেলা হবে!"

কাকাবাবু বললেন, "দেবলীনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করলে ময়নার ছেলেকে কোনওদিনই ফেরত পাবে না। আমি যা বলছি আগে শোনো, তা হলে সব গণ্ডগোল মিটে যাবে।"

সে লোকটি উঠে এসে কাকাবাবুর গলায় হাত দিয়ে বলল, "চোপ! তুই আবার কী বলবি রে? আমরা যা বলব তা তোকে শুনতে হবে।"

কাকাবাবু ধমকের সুরে বললেন, "গলা থেকে হাত সরাও! আমার গায়ে কারও হাত ছোঁয়ানো আমি পছন্দ করি না।"

লোকটি এবারে আরও জ্বলে উঠে বলল, "চোপ, হারামজাদা, ল্যাংড়া! যদি এক্ষুনি তোর গলা টিপে মেরে রেললাইনে ফেলে দিয়ে আসি, তুই কী করবি?"

কাকাবাবু বললেন, "কাউকে মেরে রেললাইনে ফেলে দিয়ে আসাই তোমাদের কায়দা?"

সে লোকটি আরও কিছু বলার আগে আংটি পরা লোকটি হাত তুলে বলল, "দাঁড়া দাঁড়া, ডাবু, যা বলার আমি বলছি!"

ডাবু বলল, "ওস্তাদ, এ-ল্যাংড়াটা আমারই ঘরে বসে আমাকে ধমকাবে, তা আমি সহ্য করব?"

ওস্তাদ বলল, "এরা লেখাপড়া জানা ভদ্দরলোক তো, প্রথম-প্রথম এরকম চোটপাট করে। দু-চারটে পুলিশের সঙ্গে চেনাশোনা আছে বলে মনে করে, ওদের সবাই ভয় পাবে। পেটে দু-চারটে কোঁৎকা মারলেই দেখবি, হাউমাউ করে কেঁদে ফেলবে। পা জড়িয়ে

ধরবে। ওসব ভদ্দরলোক আমার ঢের দেখা আছে।"

কাকাবাবুর ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল।

ওস্তাদ বলল, "ঠিক আছে, রায়চৌধুরীবাবু, তুমি কী বলতে চাও, আগে শুনি। তারপর আমাদের কাজ শুরু হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার একটাই শর্ত আছে। তোমরা দেবলীনা দত্ত নামে মেয়েটিকে ছেড়ে দেবে, যে বাচ্চা ছেলেগুলোকে চুরি করে এনেছ, তাদেরও ছেড়ে দেবে আমার সামনে, তারপরই ময়নার ছেলেকে ফেরত পাবে।"

ওস্তাদ ভুরু তুলে অবাক হওয়ার ভান করে বলল, "আমরা ছেলে চুরি করি, তোমায় কে বলল? না, না, ওসব আমাদের কাজ নয়। আমরা জিনিস সাপ্লাই করি। বর্ডারের ওপার থেকে যেসব জিনিস পাঠায়, তা আমরা এক-এক জায়গায় পৌঁছে দিই। কখন কী জিনিস পাঠাচ্ছে, তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমরা আর কী-কী চোরাই জিনিস সাপ্লাই করো, তা নিয়ে আমিও মাথা ঘামাতে চাই না। সেসব আটকানো পুলিশের কাজ। কিন্তু বাচ্চা শিশুদের বিদেশে চালান করা আমি সহ্য করব না কিছুতেই। বারোটি দুধের বাচ্চাকে তোমরা আটকে রেখেছ, আমি জানি!"

ওস্তাদ হো-হো করে হেসে উঠে বলল, "তুমি সহ্য করতে পারবে কি না, তাতে আমাদের কী আসে যায়? তুমি তো ভারী মজার কথা বলো!"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমার আর কিছু বলার নেই। বাচ্চাগুলোকে আর মেয়েটিকে ছেড়ে না দিলে তোমরা ময়নার ছেলেকে ফেরত পাবে না।"

ওস্তাদ বলল, "আরে, আরে, যাচ্ছ কোথায়?"

ডাবু নামের লোকটি এক লাফে উঠে এসে কাকাবাবুকে জাপটে

ধরতে গেল।

কাকাবাবু এক ঝটকায় তাকে ফেলে দিলেন মাটিতে।

ডাবু লোকটি বেশ শক্তিশালী, কিন্তু কাকাবাবুর হাতে যে এতটা জোর, তা সে ভাবতেই পারেনি। মাটিতে পড়ে গিয়ে সে চেঁচিয়ে ডাকল, "অনন্ত, দিনু—"

ওস্তাদ পকেট থেকে রিভলভার বার করল। বাইরে থেকে দু'জন ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল কাকাবাবুকে, তিনি নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু রিভলভার বার করলেন না, কাউকে ঘুসিটুসিও মারলেন না। একবার ওদের হাত ছাড়িয়ে চলে এলেন দরজার কাছে, আবার ওরা চারজন মিলে চেপে ধরল, একজন একটা মিষ্টি গন্ধমাখা রুমাল ঠেসে দিল তাঁর নাকে। তাতেই তাঁর হাত-পা অবশ হয়ে গেল, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে।

ওস্তাদ বলল, "ডাবু, দ্যাখ তো, লোকটার কাছে নিশ্চয়ই অস্তর আছে।"

ডাবু কাকাবাবুর কোটের পকেট চাপড়ে রিভলভারটা খুঁজে পেয়ে গেল।

ওস্তাদ বলল, "এটা বার করার সময় পায়নি। আমারটা দেখেছে তো, তাই বুঝে গেছে যে আর কোনও লাভ নেই।"

ডাবু জিজ্ঞেস করল, "অনন্ত, বাইরে পুলিশের গাড়ি আছে?"

অনন্ত বলল, "কাছাকাছি নেই, দেখে এসেছি।"

ওস্তাদ বলল, "গন্ধ শুঁকে-শুঁকে ঠিক আসবে। এখন হোটেলটা বন্ধ রাখতে হবে কিছুদিন। এখানে ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই। এ লোকটাকে আমাদের আসল ডেরায় নিয়ে চল। ময়নাকেও এখান থেকে সরিয়ে ফেলা দরকার। ময়না চলুক আমার সঙ্গে।"

ওদের দু'জন কাকাবাবুকে চ্যাংদোলা করে নামিয়ে নিয়ে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই সন্তু তড়াক করে খাট থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড়িয়ে নেমে এল দোতলায়।

কাকাবাবুর ঘরে ঢুকে দেখল, বিছানার চাদরে একটুও ভাঁজ পড়েনি। দেখলেই বোঝা যায়, রাত্তিরে ফেরেননি কাকাবাবু।

সন্তু ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল।

এরকম তো হয় না। কাকাবাবু কাল ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেলেন, সন্তুকে কিছুই বললেন না। না খেয়েদেয়ে কোথায় চলে গেলেন অত রাত্রে?

সে টেবিলটা খুঁজে দেখল, যদি তার প্রতি কোনও নির্দেশ লিখে রাখা থাকে। তাও নেই।

আর দু'দিন বাদেই কাকাবাবুর সঙ্গে তার ইজিপ্ট যাওয়ার কথা। মনে হচ্ছে, তা আর যাওয়া হবে না। বাচ্চা ছেলেগুলোকে উদ্ধারের চিন্তায় কাকাবাবু এখন অন্য সবকিছু ভুলে গেছেন। কাল তিনি সন্তুকে সঙ্গে নিলেন না কেন?

অবশ্য সন্তুর এখন কলেজ খোলা। তাই তিনি সন্তুকে এই ব্যাপারটায় জড়াতে চাইছেন না। ইজিপ্টে গেলে এমনিতেই চার-পাঁচদিন ক্লাস নষ্ট হত।

এর পর মুখটুখ ধুয়ে সন্তু পড়তে বসল।

কিছুতেই মন বসছে না। সিঁড়িতে একটু আওয়াজ হলেই সে উঁকি দিয়ে দেখে আসছে, কাকাবাবু ফিরলেন কি না। প্রত্যেকবারই নিরাশ হতে হচ্ছে।

কাকাবাবু যে রাত্তিরে ফেরেননি, এটা আলমদাকে জানানো উচিত কি না সে বুঝতে পারছে না। কাকাবাবু যদি রাগ করেন? যখন তখন পুলিশের সাহায্য নেওয়া তিনি পছন্দ করেন না।

রঘু ওপরে জলখাবার দিতে এসে জানাল, "এর মধ্যে দু'জন লোক কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসে ফিরে গেছে। টেলিফোনেও খোঁজ করছে কয়েকজন, তাদের কী বলব? শুধু বলছি, বাড়ি নেই।"

সন্তু বলল, "তা ছাড়া আর কী বলবে? বাড়িতে নেই, এটাই তো সত্যি কথা!"

রঘু বলল, "একজন খুব নাছোড়বান্দা। দু'বার ফোন করেছে। সে বলল, কাল রাত্তিরেও ফোনে পাইনি, আজ সকালেও নেই, উনি কি বাইরে গেছেন? আমি বলে ফেলেছি, তা জানি না, রাত্তিরে ফেরেননি, কবে ফিরবেন জানি না।"

সন্তু বলল, "অত কথা বলার দরকার কী? শুধু বলবে, কখন ফিরবেন জানি না।"

কে কে ফোন করেছিল, তা জানার খুব কৌতূহল হল সন্তুর, কিন্তু রঘু নাম জিজ্ঞেস করে না।

পড়বার সময় সন্তু নিজে ফোন ধরতে যাবে না, এটা বাবার হুকুম। কর্ডলেস ফোনটাও কাছে রাখতে পারবে না।

কলেজ যাওয়ার সময় হয়ে এল, তবু কাকাবাবুর পাত্তা নেই।

সন্তু স্নানটান করে তৈরি হয়ে নিল। তারপর নীচে এসে ঝট করে টেলিফোনে রফিকুল আলমকে ধরার চেষ্টা করল।

তাঁর বাড়ি থেকে জানানো হল, রফিকুল আলম কাল রাত্তির থেকে বাড়িতে নেই, কখন ফিরবেন ঠিক নেই।

দু'জনেই রাত্তিরে ফেরেননি, তা হলে কি দু'জনেই একসঙ্গে কোথাও গেছেন? নিশ্চয়ই তাই।

রফিকুল আলমের মোবাইল ফোনে কোনও সাড়াশব্দ নেই। ফোনটা বন্ধ আছে? কিংবা কলকাতা থেকে অনেক দূরে চলে গেলে ওই ফোন কাজ করে না।

দু'জনেই কলকাতার বাইরে, তা হলে কি মুম্বই চলে গেলেন নাকি?

বাসে চেপে কলেজের সামনে এসেও নামতে পারল না সন্তু। এখন শান্তভাবে ক্লাস করা তার পক্ষে অসম্ভব। মনের মধ্যে সবসময় প্রশ্নটা ঘুরছে, কোথায় গেলেন কাকাবাবু?

বাস বদল করে সে চলে এল বারাসত হাসপাতালের সামনে। এই জায়গাটাই একমাত্র যোগসূত্র।

ভাতের হোটেলটি বন্ধ। দরজায় বাইরে থেকে তালা ঝুলছে।

একটা হাতে লেখা নোটিশে লেখা আছে যে, ভেতরে মেরামতির কাজ চলছে বলে এক সপ্তাহ হোটেল খোলা হবে না।

সন্তু একবার হেঁটে গেল হাসপাতাল পর্যন্ত। তারপর ময়নার বাড়ির চারপাশে দু'বার ঘুরল। সে বাড়িতে কোনও জনপ্রাণী আছে বলে মনে হয় না।

হতাশ হয়ে সন্তু বাসস্টপে এসে দাঁড়াল। আর তো কোনও সূত্র নেই।

বাস আসতে দেরি করছে। হঠাৎ সন্তু লক্ষ করল, খানিকটা দূরে একটি লোক যেন তার দিকেই তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই সে চোখ ফিরিয়ে নিল। সিগারেট ধরাল মুখ নিচু করে।

সন্তুর মনে হল, একটু আগেও এই লোকটি তার পিছু-পিছু হাঁটছিল।

একটা ছাই রঙের শার্ট আর একই রঙের প্যান্ট পরা, বেশি লম্বাও না, বেঁটেও না, মাথায় অল্প টাক। লোকটির বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি।

লোকটি তাকে অনুসরণ করছে নাকি?

বাস আসার পর সন্তু উঠেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল, অন্য দরজা দিয়ে উঠেছে সেই ছাইরঙা পোশাক পরা লোকটি। অবশ্য কাকতালীয় হতে পারে।

এসপ্লানেডে এসে সন্তু তক্ষুনি অন্য বাসে না উঠে একটা আইসক্রিম কিনে খেতে লাগল ধীরেসুস্থে। সেই লোকটিও এখানে নেমেছে, খানিক দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে।

এর পরের বাসেও সন্তুর সঙ্গে-সঙ্গে উঠে পড়ল সে।

এবারে সন্তু নেমে পড়ল কলেজের সামনে।

এই সময়টায় একটা পিরিয়ড অফ থাকে, সবাই টিফিন খায়। সন্তু দোতলায় উঠে এসে বারান্দা থেকে উঁকি মেরে দেখল, সেই লোকটি কলেজের গেটের উলটো দিকে, পার্কের রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কলেজের পেছন দিকের মাঠ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার একটা গেট আছে। সন্তু এখন ইচ্ছে করলেই লোকটাকে ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখে কেটে পড়তে পারে। কিন্তু লোকটা কেন তাকে অনুসরণ করছে, তা জানা দরকার।

জোজোকে পাওয়া গেল কলেজ ক্যান্টিনে।

সে কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে জমিয়ে গল্প করছে। বাবার সঙ্গে সে গত বছর গিয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার গালাপাগোস দ্বীপে, সেখানে সব অদ্ভুত-অদ্ভুত জন্তু জানোয়ার আছে, সেখানে সে এমন এক ধরনের কচ্ছপ আবিষ্কার করেছে, যার সন্ধান ডারউইন সাহেবও পাননি। সেই কচ্ছপের পিঠের খোলায় নানারকম আকিবুঁকি কাটা, ভাল করে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, সেগুলো আসলে সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা গুপ্তধনের হদিস। বহুকাল আগেকার জলদস্যুরা লিখে রেখে গেছে। জোজোর বাবা সেই

সাঙ্কেতিক ভাষার মানে উদ্ধার করছেন—

একটুক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে সন্তু বুঝল, জোজোর গল্প সহজে শেষ হবে না, ঘণ্টা না বাজলে সে উঠবেও না।

একমাত্র উপায় জোজোর সঙ্গে কথা না বলা।

সে জোজোর সামনে দিয়ে হেঁটে গেল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। দরজার কাছে পৌঁছতেই জোজো ডেকে উঠল, "এই সন্তু, সন্তু—"

সন্তুর ভাল নাম সুনন্দ, কিন্তু তার ডাকনাম কলেজে সবাই জেনে গেছে। সে জোজোর ডাক শুনেও সাড়া না দিয়ে বেরিয়ে গেল।

এবারে গল্প থামিয়ে ছুটে এল জোজো।

সন্তুর হাত ধরে সে বলল, "কী রে, তুই আমার ওপর রাগ করেছিস নাকি? কী ব্যাপার? এত দেরি করে এলি?"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুই যে গল্পটা শুরু করেছিস, সেটা পরে অন্যদিন শেষ করলে চলবে?"

জোজো বলল, "হ্যাঁ, চলবে। গল্প নয়, সত্যি ঘটনা, তবে অনেক লম্বা।"

সন্তু আবার জিজ্ঞেস করল, "এর পরের ক্লাসগুলো কাট মারতে পারবি?"

জোজো বলল, "নিশ্চয়ই পারব। পরীক্ষায় আমি তো ফার্স্ট হবই, যতটা পড়েছি তাই যথেষ্ট। তুইও কাট মারবি তো?"

সন্তু বলল, "আমাকে একটা লোক ফলো করছে। তাকে জব্দ করতে হবে।"

জোজো বলল, "ফলো করছে? ভেরি ইন্টারেস্টিং।"

সন্তু বলল, "আমি আগে একা বেরোব। লোকটা যদি আমায় ফলো করে, তুইও পেছন থেকে ওকে ফলো করবি। তুই আমার কাছে আসবি না, ও লোকটা থাকবে মাঝখানে, তোকে যেন দেখতে না পায়—"

বারান্দায় এসে দেখা গেল, লোকটি এখনও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে।

জোজো বলল, "ওই টাক-মাথা লোকটা! ওকে তো একটা ল্যাং মারলেই কাত হয়ে যাবে!"

সন্তু বলল, "না, না, ওসব করিস না। আগে দেখতে হবে, ও ফলো করছে কেন!"

সন্তু কলেজ থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল আস্তে-আস্তে। পেছন ফিরে তাকাল না একবারও।

কাছাকাছি বাসস্টপে এসেও বাসে না উঠে সে এগিয়ে গেল অনেকখানি। তারপর একটা ট্রামে উঠল। আড়চোখে দেখে নিল, সেই লোকটি আর জোজো উঠেছে সেকেন্ড ক্লাসে।

আবার ট্রাম বদল করে, সন্তু নেমে পড়ল ময়দানে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের কাছে। হাঁটতে-হাঁটতে চলে এল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পর্যন্ত। এখন দুপুর, অনেকে ভেতরে দেখতে যায়, সন্তু গেটের কাছে গিয়েও ভেতরে ঢুকল না।

উলটোদিকে গিয়ে হাঁটতে লাগল মাঠের মধ্যে। রোদ্দুর গনগন করছে, মাঠে আর একটাও লোক নেই। একপাল ভেড়া ঘাস খাচ্ছে।

ভেড়াগুলোকে পেরিয়ে গিয়ে সন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েই পেছন ফিরল।

লোকটিও দাঁড়িয়ে পড়েছে, খানিকটা দূরে দেখা যাচ্ছে জোজোকে।

সন্তু এবার ওর দিকে এগিয়ে যেতেই সে পেছন ফিরে দৌড়ল। আর জোজোও দু'হাত ছড়িয়ে ধরতে এল তাকে।

লোকটি বিভ্রান্তের মতন একবার সামনে আর একবার পেছনে তাকিয়ে দেখে নিল জোজো আর সন্তুকে। তারপর দৌড়ল ডানদিকে।

কিন্তু সন্তুদের সঙ্গে পারবে কেন? ওরা দু'জনে লোকটাকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে। তবু ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতন এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল, ওরা দু'জন শেষপর্যন্ত জাপটে ধরল তাকে।

লোকটি কোনওক্রমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ফস করে একটা রিভলভার বার করে বলল, "খবর্দার, আমার গায়ে হাত দেবে না। আমি যা বলতে চাই, আগে শোনো।"

সন্তু লোকটির চোখে চোখ রেখে বলল, "ওটা তো মনে হচ্ছে খেলনা রিভলভার। মাঝখানটা ফাটা। ও দিয়ে গুলি বেরবে না!"

লোকটি বলল, "অ্যাঁ? ফাটা?"

লোকটি যেই রিভলভারটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে গেল, সন্তু অমনই এক লাফে ঝাঁফিয়ে পড়ল ওর ওপরে। জোজোও ওর পা ধরে একটা টান দিল। এবারে লোকটি একেবারে চিতপটাং!

সেই অবস্থাতেই সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমাকে মেরো না, মেরো না। আমি কোনও ক্ষতি করতে আসিনি!"

জোজো রিভলভারটা তুলে নিয়ে বলল, "এটা তো সত্যিই খেলনা রে!"

সন্তু মাটিতে বসে পড়ে বলল, "এবারে বলুন, কী ব্যাপার? আমাকে ফলো করছিলেন কেন?"

লোকটি আপন মনে বলল, "এখন বুঝছি ভুলই করেছি।"

সন্তু বলল, "কী ভুল করেছেন?"

লোকটি বলল, "এভাবে তোমাকে ফলো করা আমার উচিত হয়নি। কী যে করব, বুঝতে পারছিলাম না।"

জোজো বলল, "আমরাও তো কিছু বুঝতে পারছি না।"

লোকটি বলল, "মিস্টার রাজা রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমার দেখা করার বিশেষ দরকার। কাল রাত্রে ফোন করে জানলাম, তিনি বাড়ি নেই। আজ সকালে ফোন করে শুনি, তিনি বাড়িই ফেরেননি রাতে।

অথচ আমার খুব জরুরি কথা আছে। তাই ভাবলাম, তোমাকে ফলো করি, তুমি নিশ্চিত জানবে, তোমার কাকাবাবু কোথায় আছেন।"

সন্তু বলল, "এতক্ষণ ধরে আমাকে ফলো না করে, আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেই হত!"

লোকটি বলল, "তা ঠিক, কিন্তু আবার ভাবছিলাম, তুমিও যদি আমার কথায় বিশ্বাস না করো। যদি কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে না দাও!"

জোজো বলল, "কাকাবাবুর সঙ্গে আপনার কীসের জন্য এত জরুরি দরকার? আমাদের বলতে পারেন। তার আগে বলুন, আপনি কে?"

লোকটি বলল, "আমার নাম আবু হোসেন, ডাকনাম মামুন। তোমরা আমাকে মামুন বলতে পারো। আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ! বাংলাদেশ থেকে আসছি।"

জোজো ভুরু তুলে বলল, "প্রাইভেট ডিটেকটিভ? আমি এর আগে কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভকে স্বচক্ষে দেখিনি। গল্পের বইতেই পড়েছি।"

মামুন বলল, "ঢাকা শহরে অনেকেই আমাকে চেনে। আমি অনেক বড় মার্ডার কেস, ডাকাতির কেস ধরে ফেলেছি। শোনো ভাই, তোমরা দু'জনে কিন্তু এত সহজে আমাকে কাবু করতে পারবে না। আমি অনেক তাগড়া জোয়ানকেও ক্যারাটের প্যাঁচ দিয়ে কুপোকাত করে দিতে পারি। তোমরা তো বয়েসে ছোট, আমার শত্রুও নও, তাই মন দিয়ে লড়িনি।"

সন্তু বলল, "তা বেশ করেছেন। কিন্তু আপনি একটা খেলনা পিস্তল নিয়ে ঘুরছেন কেন?"

মামুন বলল, "আমার তো আসল পিস্তল রাখার লাইসেন্স নাই। বিশেষত ইন্ডিয়ায় এসেছি, ধরা পড়লে মুশকিল। তবে এটা

দেখালেই অনেক সময় কাজ হয়। কখন ফাটল ধরেছে, খেয়াল করিনি।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "মামুনসাহেব, কী উদ্দেশ্যে আপনার এখানে আগমন, তা তো এখনও বললেন না?"

মামুন বলল, "আমি একটা কেস হাতে নিয়ে এসেছি। তোমরা হয়তো জানো না, বাংলাদেশ থেকে অনেক শিশু চুরি হয়ে ভারতে চালান আসে। কলকাতা থেকে মুম্বই হয়ে সেই শিশুগুলিকে আবার চালান দেয় আরব দেশে।"

সন্তু আর জোজো চোখাচোখি করল।

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, শুনেছি।"

মামুন বলল, "অতি জঘন্য অপরাধ, ঠিক কি না? এ ব্যাটাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া উচিত। আমি জেনেছি, বাংলাদেশে এই শিশু চুরির পাণ্ডা শেখ নিয়ামৎ, সে শিশুগুলিকে তুলে দেয় বর্ডারের এদিকে নিতাই মণ্ডলের হাতে। এইসব কাজে মুসলমান আর হিন্দুদের মধ্যে কোনও ভেদ নাই, একেবারে গলাগলি। ওদের ফলো করে আমি দেখে এসেছি শিশুগুলিকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। বেশি দেরি করলে মুম্বই চালান হয়ে যাবে, তখন আর করার কিছু থাকবে না। কিন্তু আমার একার পক্ষে তো উদ্ধার করা সম্ভব না।"

জোজো বলল, "আপনি পুলিশের সাহায্য নিলেন না কেন?"

মামুন বলল, "চেষ্টা তো করেছি অনেক। লালবাজার হেড কোয়ার্টারে গেছি। প্রথমে তো কেউ দেখাই করতে চায় না। শেষ পর্যন্ত এক অফিসারকে ধরলাম, আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ শুনে তিনি পাত্তাই দিলেন না। বললেন, আমরা প্রাইভেট ডিটেকটিভের সঙ্গে কারবার করি না। আপনাদের গভর্নমেন্টকে চিঠি লিখতে বলুন!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "বাচ্চাগুলোকে কোথায় আটকে রেখেছে,

আপনি জানেন?"

মামুন বলল, "হ্যাঁ, লুকিয়ে গিয়ে দেখে এসেছি। পুলিশ আমার কথা বিশ্বাস করল না। তাই ভাবলাম, মিস্টার রাজা রায়চৌধুরী যদি সাহায্য করতে পারেন। ওঁর কথা অনেক বইতে পড়েছি। উনি একবার চিটাগাঙ-কক্সবাজার গিয়েছিলেন, তখন দূর থেকে দেখেছি, কিন্তু আলাপ করতে পারিনি!"

সন্তু আবার জিজ্ঞেস করল, "বাচ্চাদের কোথায় লুকিয়ে রেখেছে?"

মামুন বলল, "সুন্দরবনে। ছোট মোল্লাখালির কাছে একটা দ্বীপে।"

সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "চলুন, সেখানে যেতে হবে। এক্ষুনি!"

জোজো বলল, "এখন সুন্দরবন যাব? সে তো অনেক দূর।"

সন্তু বলল, "খুব দূর নয়, আমি আগে গেছি। ক্যানিং থেকে লঞ্চে দু'-তিন ঘণ্টা লাগবে।"

মামুনের দিকে ফিরে বলল, "শুনুন মামুনসাহেব, কাকাবাবু কোথায় গেছেন, আমি জানি না। কিন্তু তিনিও এই শিশু চুরি নিয়ে দারুণ রেগে আছেন, এই ক্রিমিনাল গ্যাংটাকে ধরবার চেষ্টা করছেন। বাচ্চাগুলো কোথায় আছে, সেটা জানতে পারলে খুবই খুশি হবেন কাকাবাবু। উনি তো ফিরবেনই। আমি সেখানে বসে থাকব, আপনারা ফিরে এসে কাকাবাবুকে খবর দেবেন।"

জোজো বলল, "আলমদাকে খবর দিলে হয় না?"

সন্তু বলল, "আলমদাও তো কলকাতায় নেই। তাঁকে পাওয়া গেলে খুব সুবিধে হত।"

মামুন জিজ্ঞেস করল, "আলমদা কে?"

জোজো বলল, "রফিকুল আলম, খুব বড় পুলিশ অফিসার, আমাদের খুব চেনা।"

মামুন বলল, "হ্যাঁ, নাম শুনেছি। দেখুন না, যদি তাঁকে পাওয়া যায়। পুলিশ সঙ্গে থাকলে আমরাই উদ্ধার করে আনতে পারি।"

সন্তু বলল, "টেলিফোনে ধরার চেষ্টা করব। কিন্তু সেজন্য দেরি করে লাভ নেই। আপনি লুকোনো জায়গাটার কথা জেনে এসে দারুণ কাজ করেছেন। আর এক মিনিটও সময় নষ্ট করলে চলবে না।"

জোজো বলল, "মামুনভাই, আপনাকে মনে হচ্ছে দেবদূত। কাকাবাবু আর আমরা এই ব্যাপারটা নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছি। আর আপনিও সেই ব্যাপারে এসে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় খবরটাই দিলেন। তা হলে এবারে শুরু হোক, অপারেশন ছোট মোল্লাখালি!"

তিনজনে দৌড়তে শুরু করল।

কে যেন ঠেলছে। কে যেন কীসব বলছে। আস্তে-আস্তে চোখ মেললেন কাকাবাবু।

প্রথমে ভাল করে কিছু দেখতে পেলেন না, ভাল করে শুনতেও পারছেন না।

তারপর দেখলেন, তাঁর মুখের কাছেই ঝুঁকে আছে একটি মেয়ের মুখ। একবার চোখ রগড়ে নেওয়ার পর চিনতে পারলেন দেবলীনাকে।

দেবলীনা বলল, "ওঠো, ওঠো, কখন থেকে ডাকছি। তুমি এত ঘুমোও কেন?"

কাকাবাবু উঠে বসলেন। এটা ঘুম নয়। কোনও ওষুধ দিয়ে তাঁকে

অজ্ঞান করে ফেলা হয়েছিল। এখনও মাথা ঝিমঝিম করছে।

দেবলীনা বকুনির সুরে বলল, "তুমি কী করে ভাল ডিটেকটিভ হবে বলো তো? এত ঘুমোলে চলে? চারপাশে খুনে ডাকাতরা গিসগিস করছে!"

দু-তিনবার মাথা ঝাঁকুনি দিলেন কাকাবাবু। চোখের দৃষ্টি খানিকটা পরিষ্কার হল। তিনি দেবলীনার একটা হাত চেপে ধরে বললেন, "ওরে, তোকে দেখে আমার এত ভাল লাগছে! কী দারুণ দুশ্চিন্তা হয়েছিল। জ্বর কমেছে?"

দেবলীনা বলল, "জ্বরটর সব হাওয়া! মনটা আনন্দে ফুরফুর করছে!"

কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, "আনন্দে ফুরফুর করছে? তোকে জোর করে ধরে আনেনি?"

দেবলীনা উচ্ছল গলায় বলল, "হ্যাঁ, তোমাদের বাড়ি থেকে বেরোলাম, দুটো লোক আমার মুখ চেপে ধরে গাড়িতে তুলে নিল। সেইজন্যই তো আনন্দ হচ্ছে!"

"আনন্দ হচ্ছে? তার মানে?"

"বাঃ, আনন্দ হবে না! তোমরা প্রত্যেকবার দূরে দূরে কোথায় চলে যাও। আমাকে সঙ্গে নাও না! এবারে বোঝো মজা! আমাকে ধরে এনেছে, তাই তোমাকেও আসতেই হবে। বেশ হয়েছে, সন্তুকে ধরেনি! সন্তু আর জোজোটা কিছু জানতেই পারবে না।"

"দেবলীনা, তোর ওপর অত্যাচার করেনি তো? গায়ে হাত তুলেছে?"

"না, মারে টারেনি! মারতে এলে আমিও ছাড়তাম নাকি?"

"খেতে টেতে দিয়েছে কিছু?"

"হ্যাঁ, একটা মেয়ে এসে রুটি-তরকারি দিয়েছিল, বিচ্ছিরি খেতে। খুব খিদে পেয়েছিল বলে আমি আধখানা রুটি খেয়েছি।"

"এ-জায়গাটা কোথায়?"

"তা আমি কী করে জানব? শুধু কুকুর ঘেউ ঘেউ করে শুনতে পাই। তোমাকে ওরা কী করে ধরে আনল?"

কাকাবাবু যে ইচ্ছে করে ধরা দিয়েছেন, সে-কথা দেবলীনাকে জানালেন না।

তিনি দেখলেন, তাঁর কিংবা দেবলীনার হাত-পা বাঁধেনি। রিভলভারটা শুধু নিয়ে নিয়েছে।

ঘরখানা প্রায় অন্ধকার। একদিকে একটা বন্ধ জানলা, আর একটা জানলার একটা পাল্লা খোলা, সেটাও ঢেকে আছে একটা গাছের ডালপালা। মনে হয়, এখন বিকেল। রিভলভারটা নিয়েছে বলে চিন্তা করলেন না, কিন্তু তাঁর ক্রাচ দুটো নেই বলে বিরক্ত বোধ করলেন। আবার ক্রাচ বানাতে হবে। এই নিয়ে যে কতবার গেল!

তিনি এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ঘরটা ঘুরে দেখলেন। ইটের দেয়াল, ওপরে টালির ছাদ। দরজাটা বেশ মজবুত, জানলাটাও ভাঙা যাবে না। বাইরে দু-একজন লোকের গলা শোনা যাচ্ছে। ঘরে একখানা খাটিয়া, তার ওপর একটা ময়লা চাদর। আর কিছু নেই।

দেবলীনা বলল, "শোনো, একবার না একবার তো কেউ খাবার দিতে আসবেই। তুমি দুমদাম ঘুসি মেরে তাকে অজ্ঞান করে ফেলবে। আমি এই বিছানার চাদর দিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলব। তক্ষুনি কিন্তু আমরা পালিয়ে কলকাতায় ফিরে যাব না। বাইরে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে সব দেখব। তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেলে মজা নেই।"

কাকাবাবু হাসলেন। এইসব লোক যে কী সাঙ্ঘাতিক ধরনের হয়, সে সম্পর্কে দেবলীনার কোনও ধারণাই নেই। এরা চোখের পলকে মানুষ খুন করতে পারে। কনস্টেবল বিমল দুবেকে মেরে ফেলেছে, আরও কতজনকে মেরে রেললাইনে ফেলে দেয়, কে জানে!

কাকাবাবু বললেন, "আসল কাজটা বাকি রেখে আমরা পালাব কেন?"

চোখ বড় বড় করে দেবলীনা জিজ্ঞেস করল, "আসল কাজটা কী বলো তো?"

কাকাবাবু বললেন, "যে বাচ্চাদের চুরি করে এনেছে, তাদের উদ্ধার করা!"

দেবলীনা বলল, "অ্যাঁ! বাচ্চাগুলোকে এরা চুরি করেছে! তবে তো এরা খুব খারাপ লোক!"

কাকাবাবু বললেন, "খারাপ লোক না হলে তোকেই বা এরা ধরে আনবে কেন?"

দেবলীনা বলল, "আমাকে ধরুকগে যাক, তাতে কিছু হয়নি। বাচ্চাদের চুরি করে, এদের খুব শাস্তি দেওয়া উচিত। সকালবেলা কয়েকটা বাচ্চার কান্নার আওয়াজ শুনেছিলাম বটে।"

কাকাবাবু বললেন, "সকালে শুনেছিলি? সারাদিন আর শুনিসনি?"

দেবলীনা বলল, "না।"

কাকাবাবু বললেন, "ঘুমের ওষুধ খাইয়ে রাখে। তা হলে ওদের এখানেই রেখেছিল, এর মধ্যে সরিয়ে নিয়ে যায়নি তো?"

দেবলীনা বলল, "কেউ আসছে না কেন? জল চাইব? তা হলে ঠিক আসবে।"

সে 'জল' 'জল' বলে কয়েকবার চিৎকার করল। তখন দরজা খোলার শব্দ হল, দেখা গেল ময়নাকে।

কাকাবাবু দেবলীনাকে জিজ্ঞেস করলেন, "একে কি ঘুসি মারা উচিত?"

দেবলীনা বলল, "খবর্দার না। মেয়েদের গায়ে হাত তুলবে না। একে আমি চিনি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমিও চিনি।"

ময়নার চোখ দুটি এখনও ছলছল করছে। একটা ডুরে শাড়ি পরে আছে। হাতে এক ঘটি জল।

কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে সে কান্না কান্না গলায় বলল, "আমার ছেলেকে তুমি ফেরত দাও!"

কাকাবাবু দেখলেন, দরজার বাইরে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। কিন্তু দূরে মানুষের গলা শোনা যাচ্ছে।

তিনি ময়নাকে বললেন, "সময় হলেই ফেরত দেব। চিন্তা কোরো না।"

ময়না চোখ মুছে ফেলে বলল, "শোনো বুড়ো, তুমি বেশি জেদ কোরো না—"

দেবলীনা বলল, "এই, আমার কাকাবাবুকে বুড়ো বলবে না! মোটেই বুড়ো নয়!"

ময়না তাকে মুখঝামটা দিয়ে বলল, "এই খুকি, তুই চুপ কর!"

আবার সে বলল, "শোনো বুড়ো, তুমি বেশি জেদ কোরো না। আমি শুনেছি, ওরা বলাবলি করছে, তোমাকে ওরা মেরে ফেলবে! আজই!"

কাকাবাবু দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, "না, মারবে না। আমাকে মারলে তোমার ছেলেকে ফেরত পাবে কী করে? আর তো কেউ জানে না। সারা জীবনেও তার সন্ধান পাবে না!"

ময়না বলল, "আমার ছেলের যদি কোনও ক্ষতি হয়, তা হলে তোমাকে আমিই খুন করে ফেলব! তোমার হাত-পা কুচি কুচি করে কাটব!"

কাকাবাবু বললেন, "তা তুমি পারবে না। শোনো, মাথা গরম কোরো না। তোমার ছেলে খুব ভাল জায়গায় আছে। তার হুপিং কাশি হয়েছে, তোমরা চিকিৎসা করাওনি। আমি ভাল ডাক্তার

দেখিয়েছি, সে সুস্থ হয়ে ফিরে আসবে। তুমি ওদের গিয়ে বলো। সবক'টা বাচ্চাকে ফেরত দিক, এই দেবলীনাকে ছেড়ে দিক, আমি সঙ্গে সঙ্গে তোমার ছেলেকে ফেরত আনার ব্যবস্থা করব। আমার কথার খেলাপ হবে না।"

ময়না বলল, "বাচ্চাগুলোকে ওরা কিছুতেই ফেরত দেবে না।"

দেবলীনা বলল, "হ্যাঁ, আগে ওদের ফেরত দিতেই হবে!"

ময়না বলল, "এই খুকি, তুই আবার কথা বলছিস? জানিস, ওরা তোর হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখতে চেয়েছিল। আমিই অনেক বলে কয়ে ওদের বাঁধতে দিইনি।"

দেবলীনা ঠোঁট উলটে বলল, "হাত-পা বাঁধত তো বয়েই যেত। আমি বুঝি খুলতে জানি না! জানো, আমার কাকাবাবু ম্যাজিক জানে, লোহার শেকল দিয়ে ওঁর হাত বেঁধে দাও, তাও খুলে ফেলবেন এক মিনিটে!"

ময়না বলল, "নেকি! এ মেয়েটার দেখছি বুদ্ধিসুদ্ধি কিছুই হয়নি। ম্যাজিক না ছাই! যখন ফস করে পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দেবে, তখন ম্যাজিক কোথায় থাকবে! এরা যখন-তখন ছুরি চালায়! তোকেও যে বিক্রি করে দেয়নি, এই তোর সাত পুরুষের বাপের ভাগ্যি!"

দেবলীনা বলল, "এঃ, আমাকে বিক্রি করবে! ইল্লি আর টকের আলু! সেরকম কেউ এখনও জন্মায়নি! আমাকে যে কিনবে তার চোখ খুবলে নেব না?"

ময়না বলল, "তুই থাম তো!"

তারপর কাকাবাবুকে বলল, "একের বদলে এক। আমরা এই মেয়েটাকে ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি আমার ছেলেকে ফেরত দাও!"

কাকাবাবু বললেন, "আগে বাচ্চাগুলোকে চাই। নইলে কোনও কথা শুনব না।"

ময়না বলল, "বাচ্চা ওরা ফেরত দেবে? তুমি কি পাগল? ওদের

জন্য কত টাকা পাবে তা জানো?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি নিজে মা হয়ে অন্য মায়েদের কষ্ট বোঝো না? এই বাচ্চাদের মেরে ফেলার জন্য পাঠাবে, ওদের মায়েরা কত কাঁদবে, তা একবারও ভেবে দ্যাখো না?"

এবার ময়না কেঁদে ফেলল। ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল চোখ দিয়ে।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, "আমি কী করব? আমার কথা কি ওরা শুনবে? আমি কিছু বলতে গেলে উলটে আমাকেই মারতে আসে!"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে তুমি এদের দলে থাকো কেন?"

ময়না উত্তর দেওয়ার আগেই দরজা ঠেলে ঢুকল দু'জন লোক।

এরা সেই ওস্তাদ আর ডাবু। ওস্তাদের হাতে একটা সরু লিকলিকে বেত।

সে ধমক দিয়ে বলল, "এই ময়না, এখানে বসে বকবক করছিস কেন? যা, রান্নাঘরে যা।"

ময়না তবু দাঁড়িয়ে রইল।

ডাবু কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "এই বুড়ো, এবার চটপট বলে ফেলো, ময়নার ছেলে কোথায় আছে? তোমাকে আমরা বসে বসে খাওয়াব নাকি?"

কাকাবাবু বললেন, "সে ভাল জায়গাতেই আছে। খাওয়ালে আর কোথায়? এ পর্যন্ত তো কিছুই খেতে দাওনি। বেশ খিদে পেয়েছে বটে!"

ডাবু বলল, "তোমাকে কচুপোড়া খাওয়াব!"

ওস্তাদ তাকে বাধা দিয়ে বলল, "বাজে বকিস না, চুপ কর। আগে কাজের কথা হোক।"

তারপর সে হাতের বেতের চাবুকটা দু'বার হাওয়ায় শপাং শপাং

করে বলল, "রায়চৌধুরী, তুমি কী চাও? তোমার সামনে এই মেয়েটাকে চাবুক পেটাব?"

কাকাবাবু বললেন, "এটা কী অদ্ভুত প্রশ্ন। আমি কি তা চাইতে পারি?"

ওস্তাদ বলল, "তা হলে কি এই মেয়েটার সামনে তোমায় চাবুক মেরে রক্ত বার করে দেব?"

দেবলীনা বলল, "ইস, কাকাবাবুর গায়ে একবার হাত তুলে দ্যাখো না! কাকাবাবু তা হলে তোমাদের এমন শাস্তি দেবেন!"

ঠিক সিনেমায় বদমাশ লোকদের মতন ওরা দু'জন বিশ্রীভাবে হা-হা করে হেসে উঠল। একে বলে অট্টহাসি।

ওস্তাদ বলল, " তাই নাকি? দেখবি তবে?"

সে শপাং করে একবার চাবুক কষাল কাকাবাবুর বুকে।

কাকাবাবু একটুও নড়লেন না। ওস্তাদের চোখে চোখ রেখে তিনি শান্ত গলায় বললেন, "দেবলীনা ঠিক বলেছে। আমার গায়ে কেউ হাত তুললে তাকে আমি শাস্তি না দিয়ে ছাড়ি না!"

ওস্তাদ আবার চাবুক তুলতেই কাকাবাবু সেটা খপ করে ধরে ফেললেন। এক হ্যাঁচকা টানে সেটা ছাড়িয়ে এনে ফেলে দিলেন নিজের পায়ের কাছে।

ওস্তাদ আর ডাবু দু'জনেই ততক্ষণে রিভলভার বার করে ফেলেছে।

কাকাবাবু ধমকের সুরে বললেন, "এসব ছেলেমানুষি করছ কেন? কাজের কথা বলতে এসেছ, সে-কথা বলো! চুরি করে আনা বাচ্চাগুলোকে কোথায় রেখেছ বলো। তাদের ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা না করলে ময়নার ছেলেকে তোমরা ফেরত পাবে না। এই আমার শেষ কথা!"

ওস্তাদ বলল, "খুব তেজ দেখাচ্ছ, অ্যাঁ? তোমার হাত-পা বাঁধিনি।

এখন যদি হাত-পা বেঁধে তোমায় জঙ্গলে ফেলে দিই, তা হলে কী করবে! বাঘগুলো অনেকদিন না খেয়ে আছে। তোমাকে পেলে দারুণ খুশি হবে। কিংবা তার আগেই সাপের কামড়ে খতম হয়ে যেতে পারো!"

কাকাবাবু সুর করে বললেন, "বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি/আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরই মাথায় নাচি..., সত্যেন দত্ত'র কবিতা পড়োনি!"

ডাবু বলল, "চোপ! ব্যাটা পদ্য শোনাচ্ছে আমাদের!"

ওস্তাদ বলল, "তুমি এমন ভাব দেখাচ্ছ, যেন কিছুতেই ভয় পাও না!"

কাকাবাবু বললেন, "'ভয়কে যারা মানে, তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়', এটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা।"

দেবলীনা খিলখিল করে হেসে উঠল।

ডাবু বলল, "ওস্তাদ, এ লোকটা বড্ড জ্বালাচ্ছে, খতম করে দিলেই তো হয়! পদ্য শুনলেই আমার গা জ্বালা করে!"

দেবলীনা বলল, "কাকাবাবু, আর একটা বলো!"

ওস্তাদ বলল, "যথেষ্ট হয়েছে! শোনো রায়চৌধুরী, তোমাকে আমি শেষবারের মতন বলছি, তোমার কোনও শর্ত আমরা মানব না, তুমি ময়নার ছেলেকে ছেড়ে দেবে কি না!"

কাকাবাবু বললেন, "সে প্রশ্নই ওঠে না!"

ওস্তাদ বলল, "রায়চৌধুরী, তুমি আমাদের অনেক কিছু জেনে ফেলেছ। তুমি নিজেই জোর করে মাথা গলিয়েছ। তোমাকে মেরে ফেলা ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় নেই!"

কাকাবাবু বললেন, "কেন বারবার এই বাজে কথা বলছ? আমাকে মারলে ময়নার ছেলেকে আর কোনওদিনই ফেরত পাবে না। এ একেবারে ধ্রুব সত্যি কথা!"

ওস্তাদ মুখখানা বিকৃত করে বলল, "ময়নার ছেলেকে পাওয়া যাক বা না যাক, তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না।"

ময়না আঁতকে উঠে বলল, "অ্যাঁ? কী বলছ? আমার ছেলে—"

ওস্তাদ বলল, "ডাবু, এই ময়নাটাকে বাইরে নিয়ে যা তো।"

ডাবু অমনই ময়নার ঘাড় ধরে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল। ময়না আর্ত চিৎকার করতে লাগল, "আমার ছেলে, আমার ছেলে—"

দেবলীনা বলল, "এরা বড্ড বাজে লোক!"

ওস্তাদ বলল, "রায়চৌধুরী, তুমি ময়নার ছেলের নাম করে আমাদের সঙ্গে দরকষাকষি করতে চাইছিলে! চুলোয় যাক ওর ছেলে। একটা ময়না গেলে আর একটা ময়না আসবে। কিন্তু তোমাকে মরতেই হবে।"

আর একটা লোক বাইরে থেকে "ওস্তাদ, ওস্তাদ" বলে ডাকতে ডাকতে ছুটে এল। সে হাঁপাচ্ছে।

ওস্তাদ জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে রে, ছোটগিরি?"

ছোটগিরি বলল, "ওস্তাদ, জেটি ঘাটে লঞ্চ এসে গেছে!"

ওস্তাদ বলল, "এসে গেছে? ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। আগে এদের দু'জনের ব্যবস্থা করে যাই।"

ছোটগিরি বলল, "বড়সাহেব বললেন, এক্ষুনি জিনিস পাচার করতে হবে। পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি দেরি করা যাবে না। একটা বাচ্চা বোধ হয় নিতে-নিতেই শেষ হয়ে যাবে!"

ওস্তাদ বলল, "বড়সাহেব নিজে এসেছে?"

ছোটগিরি বলল, "হ্যাঁ। পুরো একদিন দেরি হয়েছে বলে খুব রেগে আছে। তার ওপর বাচ্চা যদি কমে যায়—তুমি এক্ষুনি গিয়ে কথা বলো—"

ওস্তাদ বলল, "ঠিক আছে, চল, যাচ্ছি।"

কাকাবাবু ও দেবলীনার দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে সে

বেরিয়ে গেল। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল বাইরে থেকে।

এখানে ছাড়া-ছাড়া ভাবে চারখানা একই রকমের ঘর। পেছন দিকে জঙ্গল। একটা সরু ইটের রাস্তা চলে গেছে একেবারে নদীর ধারে। খুব চওড়া নদী। জোয়ারের সময় অনেকখানি জল উঠে আসে। এখন সবে জোয়ার শুরু হয়েছে, ছলাত ছলাত শব্দ হচ্ছে জলে।

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা লঞ্চ। ওস্তাদ সেই লঞ্চের ধারে গিয়ে একজন লোকের সঙ্গে কথা বলল। সে লোকটি সাহেবদের মতন ফরসা, কিন্তু খাঁটি সাহেব নয়, কথা বলছে হিন্দিতে। খুব ধমকাতে লাগল ওস্তাদকে।

একটুক্ষণের মধ্যে সেই লঞ্চে নানা জিনিসপত্র তোলা হতে লাগল। বড়-বড় সব বাক্স। আর একটা ঘরের দরজা খুলে বার করে আনা হল কতকগুলো বাচ্চা ছেলেকে। তারপর, যেমন ভেড়ার পাল তাড়িয়ে নেওয়া হয়, সেইভাবে বাচ্চাগুলোকে নিয়ে যাওয়া হল লঞ্চের দিকে। তারা সবাই কাঁদছে।

ময়নাও কাঁদছে, কিন্তু সে শব্দ করতে পারছে না, কে যেন তার মুখটা বেঁধে দিয়েছে এর মধ্যে। তাকেও ঠেলতে ঠেলতে লঞ্চে তোলা হল।

লঞ্চের এঞ্জিন চালু হয়ে গেছে, ছাড়বে এক্ষুনি। ওস্তাদ নামের লোকটি বলল, "দাঁড়াও এক মিনিট, আমি আসছি।"

সে একবার ফিরে এল কাকাবাবুদের ঘরটার কাছে।

তারপর আবার দৌড়তে দৌড়তে ফিরে গিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল লঞ্চে।

লঞ্চটা এগিয়ে গেল মাঝনদীর দিকে।

সেই সাহেবের মতন লোকটি ওপরের ডেকে দাঁড়িয়ে কথা বলছে ওস্তাদের সঙ্গে। হঠাৎ জলে ঝপাং করে একটা জোর শব্দ

হল।

কে যেন বলল, "এই রে, ময়না নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে। লঞ্চ থামাব? না হলে তো ও মরবে!"

ওস্তাদ বলল, "না, লঞ্চ থামাতে হবে না। মরুক ময়না!"

সন্তু আর জোজো বাড়িতে খবর দিয়ে, মামুনকে নিয়ে চলে এল বালিগঞ্জ স্টেশনে। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে ক্যানিং।

একবার সুন্দরবনের নদীতে একটা বিদেশি জাহাজ এসে ভাসছিল, সেটা ছিল একেবারে খালি। সেই খালি জাহাজের রহস্য ভেদ করার জন্য সন্তু কাকাবাবুর সঙ্গে গিয়েছিল সুন্দরবন অঞ্চলে। তাই ওদিকটা সে অনেকটা চেনে।

ক্যানিং থেকে অনেক দিকে লঞ্চ যায়। ছোট মোল্লাখালির লঞ্চ পাওয়া গেল একটু বাদেই।

মামুন বলল, "ছোট মোল্লাখালিতে নেমে একটা নৌকো ভাড়া করতে হবে। সেখান থেকে যেতে হবে একটা দ্বীপে। সে দ্বীপে অবশ্য নামা চলবে না, ওরা তিনজন খালি হাতে গেলে কিছুই করতে পারবে না, শুধু পাশ দিয়ে ঘুরে চিনে রাখা হবে।

বাড়িতে খবর দিতে যাওয়ার সময় সন্তু আশা করেছিল, তার মধ্যে কাকাবাবু ফিরে আসবেন। কিন্তু আসেননি। টেলিফোনে রফিকুল আলমকেও পাওয়া যাচ্ছে না। দু'জনেই কোথায় গেলেন?

প্যাসেঞ্জার লঞ্চ মাঝে-মাঝেই থামে। প্রচণ্ড ভিড়। ওরা তিনজন ওপরে সারেং-এর ঘরের সামনের দিকটায় কোনওরকমে বসার

জায়গা পেয়েছে।

বিকেল প্রায় শেষ হতে চলেছে। ছোট মোল্লাখালি পৌঁছতে অনেকটা সময় লাগবে, আজ রাত্তিরে আর ফেরাই হবে না, ওরা বাড়িতে বলে এসেছে সেরকম। কাকাবাবুর সঙ্গে যাচ্ছে বললেই বাড়ির কেউ আপত্তি করে না।

আকাশ মেঘলা, হাওয়া দিচ্ছে ফিনফিনে। খোলা জায়গায় বসে আরামই লাগছে বেশ। লঞ্চের আওয়াজে ভাল করে কারও কথা শোনা যায় না, এর মধ্যেই চলেছে মামুন আর জোজোর গল্প বলার প্রতিযোগিতা।

মামুন ডিটেকটিভগিরি করতে করতে অনেক রোমহর্ষক ঘটনার মধ্যে গিয়ে পড়েছে। সেইসব এক-একটা ঘটনা বলছে খুব জমিয়ে। জোজোই বা ছাড়বে কেন?

মামুন খালি হাতে, ক্যারাটের প্যাঁচ মেরে তিনটে ডাকাতকে জব্দ করেছে রাঙামাটিতে। তা শুনে জোজো বলল, "আমি ক্যারাটে অত ভাল জানি না, তার দরকার হয় না, একবার আরিজোনার মরুভূমিতে একদল ডাকাতের পাল্লায় পড়েছিলাম, তারা দশ-বারোজন, তাদের মধ্যে দু'জন মাত্র প্রাণে বেঁচে ছিল, আর বাকিরা...আমার সঙ্গে ছিল ডন পেড্রো, নিশ্চয়ই নাম শুনেছেন, সে ল্যাসো ছোড়ায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান, ল্যাসো হচ্ছে একরকম দড়ির ফাঁদ, ওটা আমিও ভাল জানি, আমরা দু'জনে মিলে..."

জোজোর সব গল্পই দূর বিদেশের।

সন্তু এরকম গল্প বলতে পারে না, সে চুপ করে শুধু শোনে আর মাঝে-মাঝে হাসে।

এই লঞ্চে অনেক রকম ফেরিওয়ালা ওঠে। কেউ ঝালমুড়ি, কেউ শোনপাপড়ি, কেউ চা বিক্রি করে। সেরকম কোনও ফেরিওয়ালা এলেই জোজোর গল্প থেমে যায়, এইসব খাওয়ায় খানিকক্ষণ সময়

যায়।

ওদের কাছেই বসে আছে দু'জন বন্দুকধারী পুলিশ। ওরা লঞ্চ পাহারা দিচ্ছে, না ছুটিতে বাড়ি ফিরছে, তা বোঝার উপায় নেই। প্রথম থেকেই ঘুমে ঢুলছে, মাঝে-মাঝে নিজেদের মাথা ঠুকে যাচ্ছে।

মামুন একবার বলল, "এই পুলিশ দু'জনের সাহায্য নেওয়া যায় না? তা হলে আমরা সেই দ্বীপটায় নামতেও পারি।"

সন্তু বলল, "ওরা আমাদের কথা বিশ্বাস করবে কেন? অফিসারদের হুকুম ছাড়া ওরা কিছুই করে না।"

জোজো বলল, "আগে তো ছোট মোল্লাখালি পৌঁছনো যাক। তখনও যদি পুলিশ দুটো থাকে, ওদের আমি ঠিক ভজিয়ে ফেলব!"

মামুন বলল, "আমার খালি ভয় হচ্ছে, দেরি না হয়ে যায়! বাচ্চাগুলোকে একবার মুম্বই চালান করে দিলে, তারপর কি আর উদ্ধার করা যাবে?"

জোজো বলল, "সেরকম দেখলে আমরাও মুম্বই যাব। মুম্বই শহরের পুলিশ কমিশনার আমার ছোটকাকার খুব বন্ধু। আমাকে দারুণ ভালবাসেন। তাঁকে বললেই সব সাহায্য করবেন!"

মামুন বলল, "তা হলে তো খুব ভাল হয়। আমি কখনও মুম্বই যাইনি, একবার যাওয়ার ইচ্ছা আছে। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন কমিশনার সাহেবের?"

জোজো বলল, "অবশ্যই। একটা চিঠি লিখে দেব, আপনাকে হোটেলে উঠতে হবে না, ওঁর বাড়িতেই থাকবেন।"

নদীতে অনেক নৌকো। লঞ্চটা কাছাকাছি এলে নৌকোগুলো খুব দুলতে থাকে। আবার পাশ দিয়ে অন্য লঞ্চ গেলে এই লঞ্চটাও দোলে।

আর একখানা লম্বা গল্প শেষ কোরে জোজো বলল, "সন্তু, ঝালমুড়িওয়ালা কোথায় গেল রে? স্বাদটা খুব ভাল ছিল, দ্যাখ না,

আর একবার পাওয়া যায় কি না।"

সন্তু উঠে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করে লোকটাকে পেয়ে তিন ঠোঙা ঝালমুড়ি কিনে নিয়ে এল।

সেগুলো খেয়ে আবার জোজোর তেষ্টা পেয়ে গেল।

এখানে খাবার জল নেই। সোডা-লেমনেডও বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু সেগুলো ভেজাল হতে পারে।

একটা জায়গায় লঞ্চ থামতে পাওয়া গেল ডাব। বেশ শস্তা। জোজো খেল দুটো। তার মধ্যে পাতলা শাঁস পেয়ে সে আরও খুশি।

সে সন্তুকে বলল, "ডাবের সঙ্গে শোনপাপড়ি দিয়ে খেতে দারুণ মজা লাগে। দ্যাখ না, শোনপাপড়িওয়ালাটা কোথায় গেল!"

জোজোর সঙ্গে কোথাও যেতে হলে অনবরত খেতে হয়।

মামুন বলল, "তোমরা একবার ঢাকায় এসো, খুব ভাল শোনপাপড়ি খাওয়াব। এগুলো তেমন ভাল না!"

সন্তু খাওয়া থামিয়ে পাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

ডান পাশ দিয়ে আর একটা লঞ্চ যাচ্ছে। তার ওপরে, সামনের দিকে দাঁড়িয়ে আছে একজন বেশ লম্বা চেহারার পুরুষ, সাদা প্যান্ট ও সাদা শার্ট পরা, মাথার চুল উড়ছে হাওয়ায়।

সন্তু বলল, "ওই যে, ওই লোকটি...আলমদা না?"

জোজো এক পলক তাকিয়েই বলল, "হ্যাঁ, আলমদাই তো?"

সঙ্গে সঙ্গে ওরা লোকদের ঠেলেঠুলে রেলিংয়ের কাছে এসে চিৎকার করে ডাকতে লাগল, "আলমদা! আলমদা!"

পাশাপাশি দুটো লঞ্চের আওয়াজে কিছুই শোনা যায় না। চিৎকারের সঙ্গে-সঙ্গে সন্তু আর জোজো হাত নাড়ছে, তবু সেই লোকটি তাকাচ্ছে না এদিকে।

পাশের লঞ্চটির গতি বেশি, এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে।

সন্তু এই লঞ্চের সারেং-এর কাছে এসে বলল, "ওই লঞ্চটা

থামান। আমাদের বিশেষ দরকার।"

সারেং বললেন, "ওটা তো পুলিশের লঞ্চ। আমি থামাব কী করে?"

জোজো বলল, "ভোঁ দিন। জোরে জোরে কয়েকবার ভোঁ দিন!"

সারেংসাহেব দু'দিকে মাথা নাড়লেন।

সন্তু আর জোজো কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, " সারেংসাহেব কিছুতেই রাজি হলেন না।"

অন্য লঞ্চটা এগিয়ে যাচ্ছে।

সন্তু দারুণ হতাশ হয়ে গেল। এত কাছে পেয়েও রফিকুল আলমকে ধরা যাবে না?

কয়েক মুহূর্ত পরে সে একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করে ফেলল।

ঘুমন্ত পুলিশ দু'জনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সে একজনের বন্দুক কেড়ে নিল। সেটা বাগিয়ে ধরে অন্য পুলিশটিকে বলল, "আপনার বন্দুকটা ফেলে দিন। জোজো, ওটা তুলে নে।"

সমস্ত যাত্রী ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল।

সন্তু চেঁচিয়ে বলল, "কেউ এক পা এগোবেন না। কারও কোনও ভয় নেই।"

এর পর সে বন্দুকটা আকাশের দিকে তুলে ফায়ার করল দু'বার।

এখন সারেংসাহেবও ভোঁ বাজাতে লাগলেন ঘন ঘন।

সন্তু অন্য বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়েছে।

পুলিশের লঞ্চটা বন্দুকের গুলির শব্দ শুনে থেমে গেছে।

সন্তু নিজেদের সারেংকে হুকুম দিল, "আপনি ওই লঞ্চটার গায়ে গিয়ে লাগান!"

এবার কাছাকাছি আসতেই জোজো আর সে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "আলমদা!"

রফিকুল আলম দারুণ অবাক হয়ে বললেন, "সন্তু, জোজো,

তোমরা এখানে? কে গুলি চালাল?"

সন্তু বলল, "সব বলছি। আমরা আপনার লঞ্চে যাচ্ছি!"

গায়ে গায়ে লাগতেই ওরা মামুনকে সঙ্গে নিয়ে লাফিয়ে চলে গেল অন্য লঞ্চে। যাওয়ার আগে বন্দুক ফেরত দিয়ে পুলিশ দু'জনকে বলল, "ধন্যবাদ!"

দুটো লঞ্চ আবার আলাদা হয়ে গেল।

সন্তু প্রথমেই জিজ্ঞেস করল, "আলমদা, কাকাবাবু কোথায়? আপনার সঙ্গে আছে?"

রফিকুল বললেন, "না তো! আমি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। কেন, কাকাবাবুর কী হয়েছে?"

সন্তু বলল, "আপনার সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি? কাল রাত্তির থেকে কাকাবাবু বাড়ি ফেরেননি। কিছু বলেও যাননি।"

রফিকুল চিন্তিতভাবে বললেন, "কেউ ধরে টরে নিয়ে গেল নাকি? তোমাকেও কিছু বলে যাননি যখন...আমি দিনতিনেক কোনও খবর নিতে পারিনি...তবে, জানো তো সন্তু, একটা বেশ দারুণ ব্যাপার হয়েছে, সবক'টা ব্যাঙ্ক-ডাকাত একসঙ্গে ধরা পড়েছে। এইদিকে ওদের আস্তানা। পর পর তিনটে ডাকাতি করে একটা দ্বীপে ঘাপটি মেরে ছিল। আমরা ধরতে গেলে গুলিও চালিয়েছে। তাতে ওদেরই একটা মরেছে, আর সাতটাকে বেঁধে এনেছি। টাকাও উদ্ধার হয়েছে অনেক। চলো, নীচে গিয়ে ডাকাতগুলোকে দেখবে?"

সন্তু বলল, "আলমদা, এই হচ্ছে মামুনভাই। বাংলাদেশের ডিটেকটিভ। বাংলাদেশ থেকে চুরি করে আনা বাচ্চাগুলোকে এখানে একটা দ্বীপে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, ইনি সে দ্বীপটা চেনেন। আমরা সেখানেই যাচ্ছিলাম।"

রফিকুল ভুরু কুঁচকে মামুনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে কোনও দ্বীপে রেখেছে? আপনি তা জানলেন কী করে?"

মামুন বলল, “আমি বাংলাদেশ থেকে ওদের দলটাকে ফলো করছি। এখানে একটা নৌকোয় করে দ্বীপটা দেখেও এসেছি। কিন্তু আমার একার পক্ষে তো কিছু করা সম্ভব নয়।”

রফিকুল বললেন, “ঠিক আছে। দু'রাত আমার ভাল ঘুম হয়নি। এখন বসিরহাট গিয়ে ডাকাতগুলোকে ওখানকার জেলে রাখব। আজকের রাতটা বিশ্রাম নিতে হবে। কাল সকালে দেখা যাবে, আপনি কোন দ্বীপের কথা বলছেন।”

মামুন মিনমিন করে বলল, “কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে...যদি দেরি হয়ে যায়? যদি মুম্বই চালান দেয়?”

সন্তু বলল, “আলমদা, সত্যি যদি দেরি হয়ে যায়? কাকাবাবু কোথায় গেছেন জানি না। কিন্তু আমরা যদি বাচ্চাগুলোকে উদ্ধার করতে পারি, তিনি কত খুশি হবেন! জানেন তো, এদের নিয়ে কাকাবাবু কত চিন্তা করছেন?”

রফিকুল একটা হাই তুলে বললেন, “সত্যি কথা বলতে কী, প্রাইভেট ডিটেকটিভদের ওপর আমি ঠিক আস্থা রাখতে পারি না। তবে সন্তু, তুমি যখন বলছ, তখন আজ রাতেই চেষ্টা করে দেখা যাক। বিশ্রাম পরে হবে, বাচ্চাগুলোকে উদ্ধার করতে পারলে কাকাবাবুকে খুশি করা তো যাবেই, আরও একটা বড় কাজ হবে, এ রকম ভাবে শিশু চালান দেওয়াই থামানো যাবে।”

এ লঞ্চের সারেংকে তিনি নির্দেশ দিলেন, “চলো, ছোট মোল্লাখালি!”

দেবলীনা বলল, “হঠাৎ সব কেন চুপচাপ হয়ে গেল বলো তো? সবাই চলে গেল নাকি?”

কাকাবাবু বললেন, “চলে গেলেও আবার ফিরে আসবে।”

দেবলীনা বলল, “তুমি কী করে জানলে যে ফিরে আসবে?”

কাকাবাবু বললেন, “ওই যে ওস্তাদ নামে লোকটা বলে গেল, আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে না, মেরে ফেলবে? মারার জন্যই আবার আসবে নিশ্চয়ই!”

“তখন তুমি কী করবে?”

“সে তখন দেখা যাবে! এ পর্যন্ত তো কতবার কতজন আমাকে খুন করতে চেয়েছে, কেউ তো শেষ পর্যন্ত পারেনি!”

“তোমার গায়ে কখনও গুলিও লাগেনি?”

“একবার লেগেছিল, বাঁ কাঁধে। সে এমন কিছু নয়।”

“কাকাবাবু, তুমি সত্যি-সত্যি ম্যাজিক জানো?”

“একটু-আধটু জানি তো বটেই। কিন্তু কেউ সত্যি-সত্যি সোজাসুজি বুকে গুলি চালালে ম্যাজিক দিয়ে তা আটকানো যায় না। কিন্তু আমি অন্য কথা ভাবছি। তুই একটু আগে বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ শুনেছিস?”

“হ্যাঁ, শুনেছি।”

“একটা লঞ্চের শব্দও শুনেছি। তবে কি ওরা বাচ্চাগুলোকে এখান থেকে নিয়ে গেল?”

“তা হতে পারে!”

"ময়নার ছেলেকে আর ওরা ফেরত চায় না। ময়না যতই কান্নাকাটি করুক, ওরা গ্রাহ্য করবে না। কী সাঙ্ঘাতিক লোক! ময়নার স্বামীই বা কোথায় গেল? সে হয়তো অন্য জায়গায় আছে।"

"আমার একটা অন্য কথা মনে হচ্ছে।"

এই বলে দেবলীনা বসে পড়ল খাটিয়ায়। ময়না যে ঘটিটা রেখে গেছে, তার থেকে একটু জল খেয়ে নিয়ে বলল, "আমাদের কোনও খাবার দেয়নি। যদি ওরা আর ফিরে না আসে? আমাদের না খাইয়ে মারতে চায়?"

কাকাবাবু দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "সেটা ওদের পক্ষে বোকামিই হবে! না খেয়েও কি আমরা সহজে মরব?"

দেবলীনা বলল, "আমি না খেয়ে অনেকদিন থাকতে পারি। একবার পিসির ওপর রাগ করে দেড়দিন খাইনি।"

কাকাবাবু বললেন, "দেড়দিন, না এক বেলা?"

দেবলীনা জোর দিয়ে বলল, "দেড়দিন! দেড়দিন! শনিবার বিকেল থেকে রবিবার রাত্তির পর্যন্ত। ভাত-টাত কিছু খাইনি, শুধু চকোলেট!"

কাকাবাবু বললেন, "এখানে চকোলেটই বা কোথায় পাবে বলো! তা ছাড়া, বাড়িতে খাবার আছে, তুমি রাগ করে খাচ্ছ না, সেটা তবু পারা যায়। কিন্তু খাবার নেই ভাবলেই খিদে পায় খুব। আমার তো এর মধ্যেই বেশ খিদে পাচ্ছে!"

দেবলীনা বলল, "তুমি তো সারাদিন কিছুই খাওনি!"

কাকাবাবু বললেন, "কাল রাত্তিরেও খেয়েছি বলে মনে পড়ছে না। আমারও দেড়দিন হয়ে গেল। এই জায়গাটা যে কোথায়, তা এখনও বুঝতে পারছি না। কাছাকাছি মানুষজন নেই?"

তিনি দরজাটার কাছে গিয়ে একবার ধাক্কা দিলেন।

তারপর ওপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দরজাটা শক্ত।

জানলাটা অনেক উঁচুতে। টালির ছাদ ভেঙেও তো বেরনো যাবে না।"

দেবলীনা বলল, "আমার কিন্তু বেশ মজা লাগছে। এর পর কী হবে, কিছুই জানি না! সন্তু-জোজোরাও জানে না আমাদের কথা।"

কাকাবাবু নাক দিয়ে বড় বড় শ্বাস নিয়ে বললেন, "কীসের যেন পোড়া পোড়া গন্ধ পাচ্ছি। দেবলীনা, হঠাৎ খুব গরম লাগছে না?"

দেবলীনা বলল, "কাকাবাবু, ওই দ্যাখো আগুন!"

কাকাবাবু তাকিয়ে দেখলেন, যে-জানলাটা বন্ধ ছিল, সেখান দিয়ে লকলক করছে আগুনের শিখা। জানলাটা পুড়ছে। আগুনের শিখা টালির চালের একদিকেও দেখা যাচ্ছে।

কাকাবাবুর মুখখানা উৎকট গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি বুঝে গেলেন ওস্তাদের মতলব। তাঁদের আগুনে পুড়িয়ে মারবে ঠিক করেছে। তা হলে আর খুন মনে হবে না, মনে হবে দুর্ঘটনা।

ইটের দেয়ালে সহজে আগুন লাগার কথা নয়। নিশ্চয়ই কেরোসিন ছিটিয়ে দিয়েছে। টালির ছাদ বাঁশের পাল্লা দিয়ে বাঁধা থাকে, সেখানে সহজেই আগুন ধরে যাবে, তারপর ছাদ ভেঙে পড়বে মাথায়!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘরের একটা দিক দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল।

এতক্ষণে ভয় পেয়েছে দেবলীনা, সে কাকাবাবুকে জড়িয়ে ধরল, বিবর্ণ হয়ে গেছে তার মুখ।

এরকম অবস্থায় কাকাবাবু আগে কখনও পড়েননি। শেষপর্যন্ত খাঁচায় বন্দি প্রাণীর মতন আগুনে পুড়ে মরতে হবে!

দেবলীনাকে অন্তত যে-কোনও উপায়ে বাঁচাতেই হবে।

আর বেশিক্ষণ সময়ও পাওয়া যাবে না।

তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "দেবলীনা, ভয় পাসনি। মাথা ঠিক

রাখ, আমি ব্যবস্থা করছি।"

তিনি খাটিয়াটা তুলে আছাড় মারতে লাগলেন মেঝেতে। কয়েকবার জোরে আছাড় মারার পর একটা পায়া খুলে এল।

সেটা হাতে নিয়ে তিনি চলে এলেন অন্য জানলাটার কাছে।

দেবলীনাকে বললেন, "এবারে তুই আমার কাঁধের ওপর উঠে দাঁড়া।"

দেবলীনা কাকাবাবুর গা বেয়ে কাঁধে উঠে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "জানলাটা ধরেছিস তো? এবার তুই খাটিয়ার পায়াটা দিয়ে মেরে মেরে ছাদের টালি ভাঙার চেষ্টা কর। আগুন এখনও এদিকে আসেনি। একটা টালি ভাঙতে পারলেই অন্যগুলো আলগা হয়ে যাবে।"

দেবলীনা গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে টালিতে আঘাত করতে লাগল।

খুব বেশি চেষ্টা করতে হল না, ভেঙে পড়ল একটা টালি।

কাকাবাবু ব্যস্তভাবে বললেন, "আর দেরি করিস না। তুই ছাদ দিয়ে গলে গিয়ে পাশের গাছটা দিয়ে নেমে পড়!"

দেবলীনা ছাদের ওপর উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, তুমি কী করে ওপরে উঠবে?"

কাকাবাবু জানলার কাছ থেকে সরে এসে বললেন, "আমি অন্য ব্যবস্থা করছি, তুই নেমে পড় শিগ্‌গির!"

দেবলীনা বলল, "না, তুমি না এলে আমি যাব না!"

কাকাবাবু বললেন, "পাগলামি করিস না। দরজাটায় আগুন লাগলে আমি তার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যাব। তুই নেমে গিয়ে দরজাটার কাছে গিয়ে দ্যাখ, ওটা এখনও খোলা যায় কি না!"

দেবলীনা বলল, "আমি যদি খুলতে না পারি? যদি তার আগেই ছাদ ভেঙে পড়ে?"

কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "যা বলছি, তাই শোন! বাইরে অন্য লোক থাকতে পারে, তোকে যেন কেউ দেখতে না পায়। গাছটা ধরেছিস? নামতে শুরু করেছিস?"

হুড়মুড় করে একদিকের ছাদ ভেঙে পড়ল।

ইটের দেওয়াল সহজে ভাঙবে না, ছাদই ভাঙবে। কাকাবাবু মাথা বাঁচিয়ে এগিয়ে গেলেন দরজাটার দিকে। কাঠের দরজাটায় সবে আগুন লেগেছে। দেবলীনা পৌঁছবার আগেই যদি দরজাটা পুরোপুরি জ্বলে ওঠে, তা হলে আর সে কাছাকাছি আসতে পারবে না।

কাকাবাবু ঠিক করলেন, সেই জ্বলন্ত দরজার মধ্য দিয়েই তিনি লাফিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন, তাতে শরীর খানিকটা ঝলসে গেলেও বাঁচার আশা থাকবে।

তার আগেই দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। কাকাবাবু সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে পড়লেন বাইরে। উঠে দাঁড়াবার আগেই একটা মেয়ে তাঁর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল দূরে।

সেই মুহূর্তেই ভেঙে পড়ল ছাদ।

দেবলীনাও অন্যদিক থেকে এসে পৌঁছে বলল, "এ তো ময়না!"

ময়নার সারা গা, পরনের শাড়ি জবজবে ভেজা। সে ব্যাকুলভাবে বলল, "আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দেবেন তো? আমি আপনাদের জন্য ফিরে এসেছি।"

জ্বলন্ত বাড়িটা থেকে সবাই সরে এল দূরে।

দেবলীনা বলল, "আমি জানতাম, কাকাবাবুর সঙ্গে থাকলে ঠিক বেঁচে যাব।"

সে-কথায় কান না দিয়ে কাকাবাবু ময়নাকে জিজ্ঞেস করলেন, "বাচ্চাগুলো কোথায়?"

ময়না বলল, "তাদের নিয়ে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "কোথায়?"

ময়না বলল, "তা জানি না। লঞ্চে নিয়ে গেল। আমি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে এসেছি!"

কাকাবাবু সমস্ত মুখটা কুঁচকে বললেন, "ইস! ধরা গেল না! এখন কী করা যায়? সামনে একটা নদী দেখছি। এটা কী নদী?"

ময়না বলল, "রায়মঙ্গল।"

কাকাবাবু বললেন, তার মানে এটা সুন্দরবনের একটা দ্বীপ। এখান থেকে যাওয়া যাবে কী করে?"

ময়না বলল, "সকালবেলা কোনও নৌকো গেলে ডাকতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "তার মানে এখানে বসে থাকতে হবে সারা রাত? ছি ছি ছি ছি!"

দেবলীনা বলল, "দূরে একটা কিসের আলো দেখা যাচ্ছে?"

কাকাবাবু দেখলেন, অন্ধকার নদীর বুকে দেখা যাচ্ছে একটা লঞ্চের সার্চ লাইট। সেটা আসছে এদিকেই।

কাকাবাবু বললেন, "ওটা কাদের লঞ্চ? ওস্তাদদের নাকি?"

ময়না বলল, "সেটার তো অনেক দূরে চলে যাওয়ার কথা! কিংবা ফিরেও আসতে পারে। রাত্তিরে এদিক দিয়ে অন্য লঞ্চ চলে না।"

দেবলীনা বলল, "হয়তো দামি কোনও জিনিস ফেলে গেছে।"

ময়না বলল, "আমাকে ধরার জন্যও আসতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "লঞ্চটা যে এখানেই আসছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। গাছপালার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে থাকো। দেখা যাক।"

সেই বাড়িটায় এখনও আগুন জ্বলছে। কাছে এক জায়গায় অনেক কাঠ জমা করা ছিল, সেখানেও ছড়িয়ে পড়েছে আগুন।

ধক-ধক শব্দ করতে করতে লঞ্চটা এসে থামল এই দ্বীপে। সঙ্গে সঙ্গে কেউ নামল না। কারা যেন কথা বলছে। সার্চ লাইটটা ঘুরিয়ে

ঘুরিয়ে দেখা হচ্ছে চতুর্দিকে।

দেবলীনা ফিসফিস করে বলল, "কাকাবাবু, ওই লঞ্চে সন্তু আছে, আমি গলা চিনতে পেরেছি।"

ময়না বলল, "এটা পুলিশের লঞ্চ।"

সার্চ লাইটের রেখা আবার এদিকে আসতেই কাকাবাবু দু'হাত তুলে উঠে দাঁড়ালেন।

সঙ্গে-সঙ্গে সন্তু আর জোজোর উল্লাসধ্বনি শোনা গেল। এবার ওরা লঞ্চ থেকে নেমে ছুটে এল এদিকে।

কাকাবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন এক জায়গায়।

সন্তু আর জোজো তাঁকে ডাকতে-ডাকতে আসছে, তিনি যেন তা শুনতেও পেলেন না। তাকিয়ে রইলেন, ওদের পেছনে রফিকুল আলমের দিকে।

তিনি কাছে আসতেই কাকাবাবু বললেন, "আশ্চর্য! যতসব অপদার্থের দল।"

রফিকুল কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, "কেন, কিছু ভুল করে ফেলেছি?"

কাকাবাবু বললেন, "এলেই যখন, আর একটু আগে আসতে পারোনি? পাখি উড়ে গেল। সব ব্যাটা পালিয়েছে, বাচ্চাগুলোকে সঙ্গে নিয়ে গেছে।"

সন্তু বলল, "যাঃ! পালিয়ে গেছে? কীসে করে গেল?"

ময়না বলল, "লঞ্চে। ওদের নিজেদের লঞ্চ আছে।"

সন্তু বলল, "আপনি এখন আর ওদের দলে নেই?"

রফিকুল জিজ্ঞেস করলেন, "কতক্ষণ আগে গেছে?"

ময়না বলল, "অন্তত আধঘণ্টা তো হবেই!"

রফিকুল সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে বললেন, "সবাই এক্ষুনি উঠে পড়ুন। আমাদের লঞ্চের স্পিড অনেক বেশি। এখনও ওদের ধরে

ফেলতে পারি।"

দু'মিনিটের মধ্যে ছেড়ে দিল পুলিশের লঞ্চ। আগের লঞ্চটা কোন দিকে গেছে, তা দেখিয়ে দিল ময়না।

রফিকুল বললেন, "কাকাবাবু, দৈবাৎ সন্তুদের সঙ্গে দেখা না হয়ে গেলে আমি কিছুই জানতে পারতাম না।"

সন্তু বলল, "সব কৃতিত্ব মামুনভাইয়ের। ইনিই তো জায়গাটা চিনিয়ে দিলেন।"

কাকাবাবু বললেন, "ওসব কথা পরে শুনব। এখন কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। আগে দেখা যাক, কার্য উদ্ধার করা যায় কি না।"

সবাই দাঁড়িয়ে রইল লঞ্চের সামনের দিকে। কেউ কোনও কথা বলছে না।

কিছুক্ষণ পরেই একটা লঞ্চ দেখা গেল দূরে।

রফিকুল একটা চোঙা মুখে দিয়ে বলল, "পুলিশ বলছি। সারেন্ডার করো। সারেন্ডার। পুলিশ।"

লঞ্চটা অমনই দাঁড়িয়ে গেল।

এই লঞ্চটা খানিকটা এগিয়ে যেতেই ময়না বলল, "এটা ওদের নয়। ওদেরটার নাম সাংগ্রিলা।"

অন্য লঞ্চের সারেংয়ের কাছ থেকে জানা গেল যে, সমুদ্রের মোহনার দিকে আর-একটা লঞ্চকে সে যেতে দেখেছে কিছুক্ষণ আগে।

রফিকুল বললেন, "সমুদ্রে পড়লেও এ লঞ্চ নিয়ে তো মুম্বই যেতে পারবে না। মাঝপথে কোথাও নেমে গাড়িতে উঠবে। তার আগেই ধরতে হবে ওদের।"

কাকাবাবু বললেন, "স্পিড বাড়াতে বলো!"

রফিকুল বললেন, "যদি ওরা টের পেয়ে যায় যে, আমরা ফলো করছি, তা হলে কোনও খাঁড়িতে ঢুকে পড়বে। তাতে খুঁজে পাওয়া

শক্ত হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "দরকার হলে সারারাত প্রত্যেকটা খাঁড়ি খুঁজে দেখতে হবে। ওদের কিছুতেই পালাতে দেওয়া হবে না।"

এর পর যে লঞ্চটি দেখতে পাওয়া গেল, সেটি বেশ আস্তে-আস্তেই যাচ্ছে। পুলিশ যে তাদের তাড়া করতে পারে, তা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি।

এবারেও রফিকুল একটা চোঙায় মুখ দিয়ে পুলিশের নাম করে সারেন্ডার করতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে একঝাঁক গুলি ছুটে এল।

রফিকুল বললেন, "কাকাবাবু, শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন। সন্তু, তোমরাও। এবার ব্যাটাদের পাওয়া গেছে!"

ডেকের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে কাকাবাবু বললেন, "তোমার সঙ্গে ক'জন পুলিশ আছে?"

রফিকুল বললেন, "পাঁচজন। এদের খুব ভাল ট্রেনিং আছে। আজ সকালেই ক'জন ব্যাঙ্ক-ডাকাতকে কাবু করেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমাদের পুলিশদের হাতে তো মান্ধাতার আমলের রাইফেল। স্মাগলারদের কাছে অনেক আধুনিক অস্ত্র থাকে। সাব মেশিনগান থাকলে আমরা পারব না ওদের সঙ্গে।"

দু'পক্ষেই গুলিচালনা শুরু হয়ে গেছে। ওদিক থেকে শুধু বন্দুক-রিভলভারের গুলির শব্দই শোনা যাচ্ছে। ওদের সাব মেশিনগান থাকলে এতক্ষণ পুলিশের লঞ্চ ঝাঁঝরা হয়ে যেত।

রফিকুল এক-একবার মাথা তুলে নিজের রিভলভার দিয়ে গুলি চালিয়েই আবার লুকোচ্ছেন একটা ট্যাঙ্কের আড়ালে।

মিনিট পাঁচেক পরই তিনি বললেন, "কাকাবাবু, ওদের ফায়ার পাওয়ার কম। বোধ হয় দু-তিনটের বেশি বন্দুক নেই। এর মধ্যে কয়েকজন জখম হয়েছে মনে হচ্ছে, কেউ কেউ নদীতে ঝাঁপ

দিচ্ছে।"

জোজো বলল, "ওরা পালাবে? ধরা যাবে না?"

রফিকুল বললেন, "এতবড় নদী, জোয়ারের সময় দারুণ স্রোত, তার ওপর কুমির আর কামঠ আছে। কামঠ মানে ছোট ছোট হাঙর, পা কেটে নেয়।"

কাকাবাবু বললেন, "ওদের ধরার জন্য এখন চিন্তা করতে হবে না। বাচ্চাগুলোকে উদ্ধার করাই বড় কথা।"

ওদিকের লঞ্চের গুলিচালনা হঠাৎ থেমে গেল।

পুলিশের লঞ্চটা এগিয়ে গেল সামনের দিকে। রফিকুল আবার চোঙা নিয়ে বললেন, "পুলিশ থেকে বলছি। সারেন্ডার। অস্ত্র ফেলে দাও, নইলে সবাই মরবে।"

এবার ওদিক থেকে কেউ একজন চেঁচিয়ে বলল, "আপনারা গুলি চালানো বন্ধ করুন। আমার কথা শুনুন!"

সার্চ লাইট ফেলে দেখা গেল, ডেকের ওপর আহত হয়ে কাতরাচ্ছে ফরসা সাহেবের মতন লোকটি। আর ওস্তাদ দাঁড়িয়ে আছে, তার বুকে চেপে ধরে আছে একটা পাঁচ-ছ' বছরের বাচ্চা ছেলেকে, তার একটা কানের মধ্যে গোঁজা রিভলভারের নল।

সে বলল, "আমি জানের পরোয়া করি না। মরব, তবু ধরা দেব না। কিন্তু তার আগে, তোমরা একটা গুলি চালালেই আমি এই বাচ্চাটাকে খতম করব। কিংবা, তোমাদের গুলিতে ও আগে মরবে!"

বাচ্চাটা ঠিক বুঝেছে, তীব্র স্বরে কেঁদে উঠল।

রফিকুল জিজ্ঞেস করলেন, "কাকাবাবু, কী করব?"

কাকাবাবুর মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তিনি আস্তে-আস্তে বললেন, "ওরা পারে! ওরা বাচ্চাদেরও মেরে ফেলতে পারে।"

রফিকুল বললেন, "ঝুঁকি নিতে পারি। একটা বাচ্চা যদি যায়ও,

অন্যগুলো বেঁচে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, না, আমি একটা বাচ্চারও মৃত্যু সহ্য করতে পারব না। ছেড়ে দাও! তবু তো বাচ্চারা আরও কিছুদিন অন্তত বেঁচে থাকতে পারবে!"

রফিকুল বললেন, "ছেড়ে দেব?"

এদিক থেকে কোনও উত্তর পেয়ে ওস্তাদ আবার বলল, "আমাদের পিছু ধাওয়া করতে পারবে না। তা হলে আমি নিজে মরার আগে সব ক'টা বাচ্চাকে খতম করব, তোমাদের হাতে তুলে দেব না কিছুতেই।"

রফিকুল কিছু বলতে পারলেন না।

ওস্তাদ হাঃ হাঃ করে জয়ের হাসি হেসে বলল, "সারেংসাহেব, চালাও!"

পুলিশের লঞ্চটা থেমে রইল। অন্য লঞ্চটা চলতে শুরু করল। দূরে সরে যাচ্ছে, দূরে সরে যাচ্ছে। কাকাবাবু একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন সেদিকে।

রফিকুল বললেন, "আমার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। এত কাছে পেয়েও—"

কাকাবাবু বিদ্যুদ্বেগে রফিকুলের হাত থেকে রিভলভার কেড়ে নিয়ে গুলি চালালেন। অব্যর্থ লক্ষ্য। ওস্তাদ সামান্য পাশ ফিরে ছিল, গুলি খেয়ে দড়াম করে পড়ে গেল!

কাকাবাবু রিভলভারটা ধরে রেখে বললেন, "মনে হচ্ছে আর কেউ বাকি নেই। আমি মানুষ মারতে চাই না। দ্যাখো তো, ও লোকটা এখনও বেঁচে আছে কি না!"

পুলিশের লঞ্চটা অন্য লঞ্চটার গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

সন্তু, জোজো, মামুনরা লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেল সেই লঞ্চে। ওস্তাদের বুকে-ধরা বাচ্চাটা আছড়ে পড়েছে মাটিতে, কিন্তু তার

গায়ে গুলি লাগেনি। ওস্তাদের হাতের রিভলভারটা ছিটকে পড়ে গেছে খানিকটা দূরে। সে যন্ত্রণায় চিৎকার করছে আহত পশুর মতন। সেই অবস্থাতে এদিক ওদিক খুঁজছে রিভলভারটা।

সন্তু সেটা দেখতে পেয়ে পা দিয়ে চেপে রইল।

ওস্তাদ ছ্যাঁচড়াতে-ছ্যাঁচড়াতে সন্তুর পায়ের কাছে এসে কাতরভাবে বলল, "আমায় মেরে ফ্যালো! আর-একটা গুলি চালাও! আমি ধরা দিতে চাই না।"

সন্তু রিভলভারটা ঠেলে দিল পেছনে।

রফিকুল আলম কাকাবাবুর কাছে এসে বললেন, "ওঃ, কী সাঙ্ঘাতিক টিপ আপনার! তবে, এবারেও মানুষ মারেননি। ওস্তাদের ঠিক ডান কাঁধে গুলি লেগেছে, চিকিৎসা করলে বেঁচে যাবে।"

বাচ্চাটা দারুণ কাঁদছে, তাকে কোলে তুলে নিয়েছে ময়না। আদর করে, চুমো দিয়ে চেষ্টা করছে কান্না থামাতে।

একটু পরে সে কাকাবাবুর কাছে এসে বলল, "দেখুন, দেখুন, এই বাচ্চাটাকে অনেকটা আমার কেতোর মতন দেখতে। মুখের খুব মিল আছে।"

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে বললেন, "এর মা যখন কাঁদে, তখন তাকেও বোধ হয় তোমার মতনই দেখায়!"

দাঁড়াও পাঠকবর,জন্ম যদি তব এই বঙ্গে

এসেছে নতুন বছর,২০১১ সালের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছি আমরা। অনেক আশা নিয়ে অত্যন্ত সীমিত সামর্থ্যেও মধ্যে এই লাইব্রেরিটি গড়ে তোলার প্রয়াস,আজ বর্ষশেষের পরিক্রমায় বলতেই হবে যে লক্ষ্য অনেকাংশেই সফল। দেশে বিদেশে আজ শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাদেও সক্রিয়তাই আমাকে নিত্যনতুন বাধাবিঘ্ন পার হয়েও সাইটটিতে নতুন নতুন বই আপডেট করায় নিয়োজিত রেখেছে।
যারা এ্যাড ব্রাউজ করে আমাকে আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য করছেন,তাদের প্রতি আবারো কৃতজ্ঞতা রইল। আবারও বলছি,যারা বাংলাদেশে থাকেন,তাদের এই কাজে অংশ নেওয়ার দরকার নেই। যারা প্রবাসী,তাদের কাছে অনুরোধ রইল আর একটু বেশী সময় ধরে ব্রাউজ করতে। সম্ভব হলে ভিন্ন আইপি থেকে ব্রাউজ করতে পারেন।
আপনাদের পছন্দের বইটি পেতে চাইলে চ্যাট বক্সে বা আমাকে সরাসরি মেইল করতে পারেন ayan.00.84@gmail.com এ। আমার শহরে বইয়ের প্রাপ্তি সাপেক্ষে আপনাদের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করব। আপনাদের বন্ধুদের মধ্যে যারা এ সাইটের কথা জানেন না,তাদেরকে রেফার করতে পারেন। এছাড়া শীঘ্রই ফেসবুকে একটি পেজ খোলার চিন্তা করছি,যেখানে আপনারা সংযুক্ত থাকতে পারবেন।
মূলত এখনও পর্যন্ত ওয়েবে অপ্রাপ্য বইগুলিই এখানে দেওয়ার চিন্তা আছে,তাই কোন বই আপনি সাজেষ্ট করার আগে বিভিন্ন ফোরাম ঘুরে দেখে নিন সেখানে বইটি আছে কিনা।
বর্তমানে মূলত ভারতীয় লেখকদের লেখাই প্রকাশ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে,পরবর্তীতে বাংলাদেশী লেখকদের লেখাও আনা হবে।
এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে লেখক,প্রকাশকদের কোনওভাবে ক্ষতি হোক তা আমরা চাই না,তাই কোন বই আপনার ভাল লাগলে তার হার্ডকপিটা বাজার থেকে কেনার চেষ্টা করুন,প্রিয়জনকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বই উপহার দিন। আর বেশী বেশী করে বাংলা বই পড়ুন। আপনাদের জীবন বইয়ের আলওকে আলোকিত হয়ে উঠুক,এই কামনায় নতুন বছরের শুভেচ্ছা আরও একবার জানিয়ে শেষ করলাম।

মোবাইলঃ 8801734555541
8801920393900